পৃথ্বীপুরুষ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

আল-আমীন মিশন

পৃথ্বীপুরুষ
আল-আমীন বার্তায় প্রকাশিত কালাম-বিষয়ক নিবন্ধগুচ্ছ

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৭

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক
প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রক: ডায়মন্ড আর্ট প্রেস
৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

একশো টাকা

যারা স্বপ্ন দেখে,
যারা লক্ষ্যে অবিচল,
সেইসব শিশু-কিশোরদের।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম ॥ একরাম আলি ১১

শৈশবের দিনগুলি ॥ সেলিম মল্লিক ২২

কালাম যখন ছাত্র ॥ জাভেদ ইকবাল ৩২

ভারতীয় হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ ॥ অতনুমিথুন মণ্ডল ৪৪

চিরকালীন শিক্ষক ॥ একরামূল হক শেখ ৬৩

জনতার রাষ্ট্রপতি ॥ নাজিব আনোয়ার ৭৮

স্বপ্নের কয়েক মিনিট ॥ তাহেরা খাতুন ৮৪

চিরন্তন অনুপ্রেরণা ॥ একরামূল হক শেখ ৮৮

জীবনপঞ্জি ১২৯

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ১৩২

স ম্পা দ কী য়

তামিলনাড়ুর একটি জেলা রামনাথপুরমের ছোট্ট একটু অংশ পাম্বান দ্বীপ। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন আর সমুদ্রবেষ্টিত। সেখান থেকেই একটি অস্পষ্ট স্থলরেখা এঁকেবেঁকে চলে গেছে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত, রামায়ণের কাহিনিসূত্রে যেটি লোকমুখে রামসেতু। আন্তর্জাতিক নাম অ্যাডাম ব্রিজ। ভারতীয় নাম সেতুবন্ধনম।

প্রাচীনকাল থেকেই পাম্বান দ্বীপের প্রধান জনপদ রামেশ্বরম। ছোট্ট হলেও শহরটির ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। এটি হিন্দুদের অতি পবিত্র চার ধামের একটি। ভয়ংকর দারিদ্র্যে ভরা দ্বীপের এই শহরেই জন্ম এমন এক শিশুর, যিনি পরে হয়েছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ভারতের লোকপ্রিয় রাষ্ট্রপতি। শুধু তা-ই নয়, নতুন আর শক্তিমান এক ভারত গড়তে সারা দেশের তরুণসমাজকে উদ্দীপিত করার চেষ্টায় ব্যয় করেছিলেন নিজের সমস্ত সময়। তাঁর নাম আমরা সবাই জানি। আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম। ওই ছোট্ট দ্বীপে জন্মে এতটা শক্তি কোত্থেকে পেলেন তিনি?

পাম্বান দ্বীপটির আয়তন মাত্র ৯৬ বর্গকিলোমিটার। যে-বছর তাঁর জন্ম, সেই ১৯৩১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৯.৫ শতাংশ। তাঁর দশ বছর বয়সে, ১৯৪১-এ, সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬.১ শতাংশে, যে-সংখ্যায় বালক কালামেরও অংশ ছিল। এখন দ্বীপটির অবস্থা কেমন? ২০১১-র সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা ৮২,৬৪২ জন। আর রামেশ্বরম শহরটির? লোকসংখ্যা ৪৪,৪৫৬ জন। শহরে সাক্ষর ৭৩.৩৬ শতাংশ। আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে শতকরা ৩০ জন মানুষ। শহরে হিন্দু ৮৭.৪, খ্রিস্টান ৮.১৩, মুসলমান ৪.৩৬ শতাংশ।

এইসব সংখ্যা একের পর এক এল বটে, কিন্তু এরা মূক। কথা বলতে পারে না। তবু সংখ্যাগুলির দিকে

তাকিয়ে আমরা যদি একাগ্র হয়ে কান পেতে রাখি, কিছুই কি শুনতে পাই না? মনে রাখতে হবে, দেশ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল। ভয়ংকর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯৩৯-এ, তাঁর ন-বছর বয়সে। তার আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের বাধ্যত সহযোগী ভারতের ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিশাল, টাকার মূল্যে তৎকালীন আশি কোটি পাউন্ড।

এমন এক সময়ে ছোট্ট, দারিদ্র্যপীড়িত, দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের দুস্থ পরিবারে জন্ম আবদুল কালামের। এবং সগৌরব উত্থান। তাঁর সেই স্বপ্নের উত্থান আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, কর্মে যদি অবিচল থাকা যায়, কঠোর পরিশ্রমে পিছপা না হই যদি, দারিদ্র্য বা পশ্চাৎপদ সমাজ বা পরিসংখ্যানগত দীনতা— কোনো প্রতিবন্ধকতাই কাউকে বিচলিত করতে পারে না। কত রকমের বাধা যে পেরিয়ে আসতে হয়েছে আবদুল কালামকে, কল্পনা করাই আজ অসম্ভব।

এমন এক মনীষীর প্রয়াণের পর 'আল-আমীন বার্তা'র দুটি সংখ্যায় এই সংকলনের লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। জুলাই-অক্টোবর ২০১৫ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল— 'সেই মানুষটির প্রতি 'আল-আমীন বার্তা' শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এই সংখ্যায় সাতটি রচনা প্রকাশ করে।' পরের সংখ্যায় আরও একটি লেখা প্রকাশিত হয়। মোট আটটি নিবন্ধে প্রয়াত স্বপ্নদ্রষ্টার জীবন ও মননের রূপটি আঁকার সাধ্য মতো চেষ্টা করা হয়েছে।

তাঁর জীবনকাহিনি পড়ে আমরা যদি উপযুক্ত মানুষ হয়ে ওঠার পথ খুঁজে পাই, এই সংকলনটি তবেই সার্থকতা পাবে।

খলতপুর, হাওড়া
সেপ্টেম্বর ২০১৭

এম নুরুল ইসলাম

আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম

একরাম আলি

ছবি তোলার আয়োজন চলছে। ইনসটিটিউটের চারদিকে নিত্যদিনের মতোই ব্যস্ততা। আনন্দের মাঝে চাপা বিষাদের সুর ঘনীভূত হচ্ছে মাঠের ওই ছবি তোলার জায়গাটিকে কেন্দ্র করে। একদল ছাত্র আজ বিদায় নেবে। তারা পাস করে কেউ যাবে কর্মজগতে, কেউ উচ্চশিক্ষায়। এই ক-বছরের একসঙ্গে থাকা, হইহুল্লোড়, একসঙ্গে লেখাপড়ার আনন্দঘন পরিবেশ থেকে দূরে চলে যাবে তারা। তাই, শিক্ষকদের সঙ্গে দল বেঁধে ছবি তুলে বিদায়ী ছাত্রদের এই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার অনেক দিনের প্রথা ম্যাড্রাস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজির। ছাত্ররা সুশৃঙ্খলভাবে তিনটি সারিতে দাঁড়িয়ে। মাঝে অধ্যাপকেরা চেয়ারে আসীন। সবাই চুপ।

হঠাৎ একজনের ভারী গলা। প্রফেসর স্পনডার না? হ্যাঁ, স্পনডারই তো! কী বলছেন তিনি? কাকে যেন খুঁজছেন। কাকে?

— কালাম কোথায়, কালাম?

ছোটোখাটো চেহারার এক তরুণ, কালো, তৃতীয় সারিতে দাঁড়িয়েছিল। নিজেকে যেন লুকিয়ে রাখতে চায় সে। পারল না। প্রিয় অধ্যাপকের ডাকে উঠে দাঁড়াতে হল।

প্রফেসর স্পনডার বললেন, 'এদিকে এসো। সামনে। আমার পাশে বোসো।'

ছেলেটি হকচকিয়ে গেল। এতসব অধ্যাপক-ছাত্রের সামনে সে একা এমন ডাক পাবে, ভাবেনি। কিন্তু তখনও তার অবাক হওয়ার কিছু বাকি। প্রফেসর স্পনডার বললেন, 'পেছনে কেন, তুমি আমার সেরা ছাত্র। পরিশ্রম করলে ভবিষ্যতে আমাদের নাম উজ্জ্বল করবে। এসো।'

একঝাঁক সহপাঠীর সামনে ছেলেটি সে-দিন বিব্রত বোধ করেছিল। কিন্তু প্রফেসর স্পনডারের নির্দেশ অমান্য করার উপায়ও ছিল না। এগিয়ে এসে বসতে হয়েছিল স্যারের পাশে।

সে-দিনের সেই লাজুক ছেলেটিই আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম।

আমাদের দেশের একেবারে নীচের দিকে যে-লেজটা ঝুলে আছে আর প্রায় ছুঁয়ে আছে আরেকটি দেশ শ্রীলঙ্কাকে, সেই লেজের একটা ছেঁড়া অংশ, পাম্বান নামের ছোট্ট দ্বীপ সেটা, সেই দ্বীপের রামেশ্বরম শহরে, এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। দিনটি ছিল ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর। বাবা জয়নুল আবেদিন আর মা আশিয়াম্মার এক মেয়ে আর তিন ছেলের পর কনিষ্ঠ সন্তান তিনি।

পূর্বপুরুষরা বেশ কিছু বিষয়সম্পত্তির মালিক হলেও, তাঁর জন্মের সময় বসতবাড়িটি ছাড়া সম্পদ বলতে পরিবারের বিশেষ কিছুই ছিল না।

আগে পরিবারের ছিল নৌ-চলাচলের ব্যাবসা। মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপে, এমনকী শ্রীলঙ্কাতেও, মালবহনে তাঁদের পরিবারের নৌকাই ছিল ভরসা। ১৯১৪ সালে পাম্বান ব্রিজ তৈরি হলে সেই ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারটি উপার্জনহীন হয়ে পড়ে। শিশু-কালাম যখন একটু একটু করে বড়ো হচ্ছেন, তখনও অর্থ না-থাকলেও পরিবারের বড়োদের মূল্যবোধটুকু জাগ্রত রয়েছে। আর্থিক অবস্থা এমনই যে, প্রায় শৈশবেই কিছু উপার্জনের চেষ্টায় কালামকে খবরের কাগজ বিক্রি করতে হয়েছে।

তবু, কালামের শৈশবের কথা পড়লে মনে হয়, তাঁর বাবা-মা যেন জানতেন, তাঁদের এই ছেলেটি একদিন দেশবিখ্যাত হবে।

কী করে এমনটা হল।

আসলে কেউ দেশবরেণ্য বা বিখ্যাত হলে তাঁর ছোটোবেলাটি বর্ণনাকারী খুঁটিয়ে দেখেন। আর তাই আমরা দেখি সেই শিশুটির গুণপনাগুলি। দেখি অনুসন্ধিৎসা, শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা আর একাগ্রচিত্ততা। আবদুল কালামের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছিল।

তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের প্রিয় যেমন, তেমনই বাধ্য সন্তান। স্কুলে খুব ভালো ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করায় কোনো ঘাটতি ছিল না তাঁর। পড়তেন প্রায় সারাদিন। বিশেষ করে পড়ে থাকতেন অঙ্ক নিয়ে। এই অভ্যাসটি ছিল আজীবন।

তখন তিনি রামনাথপুরমের সোয়ার্জ স্কুল শেষে তিরুচিরাপল্লির সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে ফিজিক্সে স্নাতক হয়েছেন ১৯৫৪ সালে আর পড়তে গিয়েছেন চেন্নাইয়ের ম্যাড্রাস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজিতে। এয়ারোনটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে সেখানের পাঠ শেষের দিকে। একদিন এমআইটি-র ডিরেক্টর প্রফেসর শ্রীনিবাসন চার ছাত্রকে বেছে নিয়ে স্বল্প-উচ্চতায় ওড়ার একটি যুদ্ধবিমানের নকশা করতে বললেন। বিমানের বায়ুগতি-সংক্রান্ত নকশা তৈরির এবং আঁকার ভার পড়ল কালামের ওপর। কয়েক দিন পর কালামকে ডেকে জানতে চাইলেন, কতটা হয়েছে? বললেন, মোটেই এগোয়নি। কালাম অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কেন হয়নি। এবং এটাও বললেন, আরও মাস খানেক লাগবে।

শ্রীনিবাসন কোনো কথা শুনতে রাজি নন। সময় দিলেন মাত্র তিন দিন। বললেন, আজ শুক্রবার বিকেল। সোমবার সকালের মধ্যে কাজ শেষ না-হলে তোমার স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যাবে।

সব্বোনাশ! স্কলারশিপ না-পেলে তো লেখাপড়াই বন্ধ হয়ে যাবে! কালাম সারারাত কাজ করলেন। এমনকী খেতেও গেলেন না। সকালে যখন কাজ শেষ হয়ে এসেছে, মনে হল, ঘরে কেউ যেন এসেছেন। প্রফেসর শ্রীনিবাসন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। পরনে টেনিসের পোশাক। সদ্য খেলে ফিরছেন। এগিয়ে এসে কাজ দেখে জড়িয়ে ধরলেন ছাত্রটিকে। তাঁর মুখ দিয়ে তখন উচ্চারিত হচ্ছে, 'অসম্ভব চাপ দিয়েছি তোমাকে। সেই চাপ নিয়ে যতটা নিখুঁত কাজ তুমি করেছ, ততটা আমি আশা করিনি।'

আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালামের জীবনে এমন ঘটনা অনেক বার ঘটেছে। আর, তিনি প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সাফল্যের।

যখন তিনি ব্যাঙ্গালোরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এয়ারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এসটাবলিশমেন্টে, একটা টিম তৈরি করে তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল স্বদেশি প্রযুক্তিতে একটি হোভারক্রাফট নির্মাণের। সময় দেওয়া হল তিন বছর। একদল নতুন ছেলে, কোনো প্রযুক্তিগত সহায়তা কোনো দিক থেকেই পাবার আশা নেই, ভরসা শুধু নিরলস চেষ্টা, লেগে পড়লেন কাজে।

দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তখন ভি কে কৃষ্ণমেনন। প্রকল্পটির অগ্রগতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। এই ছোট্ট প্রকল্পটিতে তিনি দেখেছিলেন দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের স্বদেশি উৎপাদনের সূচনা। ব্যাঙ্গালোরে এলেই চলে আসতেন কাজের অগ্রগতি দেখতে। কিন্তু প্রকল্পটি সম্বন্ধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মত সবাই মানতে পারেননি। অনেকে বললেন, একদল উন্মাদ অসম্ভবের পিছনে ছুটছে। কালামকে বলা হয়েছিল 'কুলির সর্দার'। একটা 'গেঁয়ো ভূত', যে বোকার মতো মনে করে, আকাশে ওড়াটা এমন কিছু না!

এমন পরিস্থিতিতে যা হয়, কালামের মনোবল বেড়ে গেল।

প্রকল্পের কাজ বছর খানেক চলার পর একদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এলেন। মডেল দেখলেন। তখনও জোড়া দেওয়া বাকি। খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন সবকিছু। নিন্দুকদের কথা অগ্রাহ্য করে বললেন, আগামী বছর যেন হোভারক্রাফটটি উড়ানে যেতে পারে, সেই নিশ্চয়তা তিনি চান।

হোভারক্রাফটটির নাম রাখা হল 'নন্দী'। শিবের বাহন। দেখে প্রস্তুতকারকরাই অবাক! কালাম তাঁর দলকে বললেন, 'এটি কোনো পাগলদের তৈরি নয়। আপনাদের মতো একদল দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এটি তৈরি করেছেন। দেখবার জন্যও নয়, এটি তৈরি হয়েছে উড়বার জন্য।'

নির্দিষ্ট সময়ের এক বছর আগেই হোভারক্রাফট তৈরি শেষ। যে-দিন ওড়ার কথা, ভি কে কৃষ্ণমেনন হাজির। নিরাপত্তার কথা ভেবে সঙ্গের অফিসারদের আপত্তি ছিল প্রবল। কিন্তু সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি উঠে বসলেন সদ্য নির্মিত বায়ুযানে।

একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ছিলেন মন্ত্রীর সঙ্গী। তিনি কিছুতেই কালামের মতো অনভিজ্ঞ চালকের হাতে

মাননীয় মন্ত্রীকে ছেড়ে দিতে রাজি নন। কালাম মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন, বসেই রইলেন চালকের আসনে। কৃষ্ণমেনন হেসে সম্মতি জানানোয় দেশে তৈরি প্রথম বায়ুযান আকাশে উড়ল। মন্ত্রী বললেন, 'আরও শক্তিশালী হোভারক্রাফট তৈরির কাজে লেগে পড়ুন। তারপর আবার আমাকে ডাকুন উড়বার জন্য। আমি আসবই।'

সেই হোভারক্রাফট সম্পূর্ণ নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনোদিন ব্যবহার করেনি। এ নিয়ে তাঁর কষ্টের শেষ ছিল না। তখনই তিনি উপলব্ধি করেন, সমস্ত কিছুরই সীমা নির্দিষ্ট করা আছে। তাকে লঙ্ঘন করে এগোনো যায় না। তবু, চাকরিজীবনের শেষে পৌঁছেও তিনি আফশোস করে গেছেন এই বলে যে, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হোভারক্রাফট থাকতেও আজও প্রতিরক্ষা দপ্তর বিদেশ থেকে হোভারক্রাফট আমদানি করে!

কিন্তু ওই হোভারক্রাফটের সফলতার জন্যই তিনি ডাক পান প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশনে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। সেখান থেকে ১৯৬৯-এ তাঁকে যেতে হল থুম্বায়, সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশনে, যে-প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা ইসরো নামে চিনি। মাঝখানে ঘুরে এসেছেন নাসায়। সেটা ১৯৬৩-'৬৪ সাল। ইসরো থেকেই তাঁর জীবনের প্রকৃত উত্থানের শুরু।

কী করেছেন তিনি?

কালাম শিশুকালে পাখির ওড়া দেখে আকাশে উড়তে চেয়েছিলেন। বালকবয়সে তীব্র বেগে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান উড়তে দেখে স্বপ্ন জেগেছিল, বড়ো হয়ে একদিন বিমানচালক হবেন। এবং সত্যি-সত্যিই ম্যাড্রাস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বিমানচালক হওয়ার ইন্টারভিউ দিতে দেরাদুন গিয়েওছিলেন। কিন্তু হয়েছিলেন নবম। অর্থাৎ ব্যর্থ। কেননা, পদ ছিল মাত্র আটটি। এ হেন কালাম ইসরোয় হলেন ভারতের প্রথম উপগ্রহ প্রকল্পের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর।

চার দশক ধরে ভারতীয় মহাকাশে উপগ্রহ প্রকল্পের তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। ভারতবাসীর জন্য অসীম মহাকাশের দরজা তিনি খুলে দিয়েছেন।

সেটা ছিল ১৯৮০ সাল, জুলাই মাস। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রকেট এসএলভি-৩ যেদিন রোহিণী নামের উপগ্রহটিকে নিজের কক্ষপথে সফলভাবে পৌঁছে দেয়, সেই দিনই ভারতের নাম সগৌরবে যুক্ত হয়ে গেছে সেই গুটি কয়েক দেশের নামের সঙ্গে, যারা মহাকাশ ক্লাবের সদস্য এবং দুনিয়ার ক্ষমতাধর বলে প্রসিদ্ধ।

সেই যে ১৯৫৭ সালে ম্যাড্রাস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে বেরিয়ে প্রতিরক্ষা গবেষণা বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন, তারপর থেকে অনধিক চল্লিশ বছর আবদুল কালাম নানাভাবে এই কাজটি করে গিয়েছেন এবং নানাভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই কাজে।

একটানা কুড়ি বছর তিনি মহাকাশ উৎক্ষেপণ যানের, বিশেষ করে পিএসএলভি-র রূপরেখার বিবর্তন-গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন ইসরোয়।

এরপর তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে দেশীয় সুসংহত

মিসাইল তৈরি ও তার উন্নয়নের। এই প্রকল্পের তিনিই ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। তাঁরই পরিকল্পনায় সফলতা পায় দুটি অতি শক্তিশালী মিসাইল, যাদের আমরা চিনি অগ্নি আর পৃথ্বী নামে।

এই সাফল্যের ফলস্বরূপ আবদুল কালামকে ১৯৯২-এর জুলাইয়ে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা করা হয়। ১৯৯৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত কালাম ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এই পদে। পরিকল্পিত মিসাইল সিস্টেমে প্রতিরক্ষা বিভাগকে তিনি সাজিয়েছিলেন এবং পোখরান-২ পরমাণু বিস্ফোরণও এই সময়েই ঘটেছিল, যার ফলে ভারত ঢুকে পড়ে পরমাণু অস্ত্রধারী দেশের তালিকায়।

১৯৯৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের সামনে দিয়েছিলেন এমন এক স্বপ্ন, যাতে ২০২০ সালে দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে দুনিয়ায় পরিচিতি পায়। সারাদেশ ঘুরে কমপক্ষে পঞ্চাশ লাখ ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশেছেন, যাদের বয়স সতেরো বছরের কম। দেশকে শক্তিশালী করতে সব সময় সদর্থক এবং গঠনমূলক মনোভাব বজায় রেখেছেন।

যেহেতু ফাইবার গ্লাস টেকনোলজিতে তিনি ছিলেন ভারতের অগ্রদূত, চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তাঁর অবদান কম নয়। একদল চিকিৎসকের সহায়তায় হৃদরোগে আক্রান্তদের জন্য সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে একটি স্টেন্ট তৈরি করেন, যার খরচ আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় নগণ্য। স্টেন্টটির নাম রাখা হয় কালাম-রাজু কার্ডিয়াক স্টেন্ট।

২৫ জুলাই ২০০২ আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। ২৫ জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত ছিলেন এই পদে। রাষ্ট্রপতি হিসেবেও তিনি অনন্য। দেশের সমস্যাগুলোকে ভেতর থেকে জানবার জন্য সমাজের নানা স্তরের কমপক্ষে পাঁচ লাখ মানুষের সঙ্গে তিনি মিটিং করেছেন। এদের মধ্যে অতি সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি, যে-কারণে তাঁকে বলা হত পিপলস প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ আমজনতার রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি ভবন যে-দিন ছেড়ে আসেন, সঙ্গে ছিল অতি সামান্য জিনিসপত্র। আর, তারপর থেকেই

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করে গেছেন। নিজেকে শিক্ষক হিসেবে দেখতেই পছন্দ করতেন আবদুল কালাম।

১৯৮১ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৯০ সালে পদ্মবিভূষণ এবং ১৯৯৭ সালে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন প্রাপ্তি তাঁর শিক্ষকসত্তাকে আরও উজ্জ্বল করেছে। দেশের এবং বিদেশের আটচল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট দিয়ে কালামকে যে-সম্মান জানিয়েছে, তাতে তাঁর তথাকথিত মিসাইল ম্যান হিসেবে পরিচিতি অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। উজ্জ্বল হয়েছে এমন এক শিক্ষক-চরিত্রের, যিনি নতুন এক শক্তিশালী ভারত গড়ার জন্য দেশময় ঘুরে ঘুরে তরুণ সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করেছেন। শুধু দেশ কেন, পৃথিবীর যেখানেই গেছেন, সবচেয়ে আগে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। যে উন্নত এবং বৈষম্যহীন পৃথিবীর স্বপ্ন তিনি দেখতেন, সেই স্বপ্নবীজ কালাম ছড়িয়ে দিতেন ছোটোদের নরম মনের মাটিতে। একদিন সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হবে। শাখাপ্রশাখা হবে। পাতা হবে। তিনি সেদিন থাকবেন না হয়তো। কিন্তু এই বসুন্ধরা সেই পল্লবিত স্বপ্নের ছায়া পাবেই।

হ্যাঁ। তিনি নেইও। এবং এই কাজটি করতে-করতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম। ২৭ জুলাই ২০১৫, শিলঙের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজিতে ছাত্রদের সামনে ভাষণ দিতে-দিতেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর।

কিন্তু শুধু বয়স দিয়ে একটা জীবন মাপা যায় না। মাপতে হয় ভাবনা আর কর্ম দিয়ে। প্রয়াত কালামের সারাজীবনের কর্মের কিছুটা পরিচয় আমরা পেলাম। কিন্তু তাঁর ভাবনা কেমন ছিল? তাঁর বিশ্বাস?

বাবা আবুল পাকির জয়নুল আবেদিন ছিলেন রামেশ্বরমের মসজিদের ইমাম। খুব ছোট্ট যখন, বাবার হাত ধরে মসজিদে যাওয়া শুরু। বাবা এমনভাবে কনিষ্ঠ পুত্রের ভিত্তিটা তৈরি করেছিলেন যে, সারাজীবন কালাম ইসলামের অবশ্যকর্তব্য থেকে চ্যুত হননি। দৈনিক নামাজ এবং রমজানের রোজা তিনি আজীবন পালন করেছেন। শুধু নামাজ-রোজাই নয়, বাবাকে দেখে তিনি এই দেশের অন্তরটিকেও চেনার চেষ্টা

করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রতি সন্ধ্যেয় আমার বাবা জয়নুল আবেদিন, মসজিদের ইমাম, পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, যিনি রামনাথস্বামী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এবং গির্জার প্রিস্ট গরম চায়ের গ্লাস নিয়ে বসে দ্বীপের ভালোমন্দ আলোচনা করতেন।'

মনে রাখতে হবে, রামেশ্বরম দ্বীপটি খুব ছোটো হলেও, গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এখানেই রয়েছে ভারতবিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র রামনাথস্বামীর মন্দির। প্রতিদিন সারা দেশ থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সেই মন্দির দর্শনে আসেন।

সেই ছোটোবেলায় দেখা চা-পানের দৃশ্যটি কালামের চোখ খুলে দিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, বহুভাষী এবং বহু ধর্মের এই দেশের মঙ্গালের ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা এবং সহযোগিতা, ইংরেজিতে কালাম বলেছেন— ডায়ালগ অ্যান্ড কোঅপারেশন। এবং এই কথোপকথনের মাধ্যমেই আমরা পরস্পরকে চিনতে জানতে পারব। কালাম যেমন ইসলামের ধর্মীয় বিধান মেনে চলতেন, অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন পরম করুণাময়কে, পড়তেন কোরআন শরিফ, তেমনই শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতাও ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। এই দেশের মাটিকে, তার মূল সুরটিকে চেনার সন্ধানে, বলা ভালো, নিজেকে জানার সন্ধানে, তিনি বহু সাধকের কাছেও গিয়েছেন। এমন আর-একজন মানুষের খোঁজ আমরা পাব ইতিহাসে। তিনি সম্রাট আকবর। যদিও আকবরের পথ ছিল আলাদা, তবু দু-জনের লক্ষ্য ছিল এক।

তিনি মনে করতেন, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ইসলামের একটি প্রস্তরফলক। তাঁর অমর বাণী: 'মহৎ মানুষদের জন্য ধর্ম হচ্ছে এমন একটা পথ, যা বন্ধুর সংখ্যা বাড়ায়। ছোটো মানুষেরা ধর্মকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে নেয়।'

শুধু কি তাঁর বাণী দিয়েই বুঝব তাঁকে? না। বেশ কয়েকটি বই কালাম লিখে গিয়েছেন আমাদের জন্য, যে-বইগুলো পড়লে মানুষটিকে জানতে আমাদের সুবিধে হয়।

তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'উয়িংস অফ ফায়ার' যেমন আছে এই তালিকায়, তেমনই আছে

‘ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্লুইড মেকানিকস অ্যান্ড স্পেস টেকনোলজি’র মতো জটিল বিজ্ঞানের বই। যেমন আছে ‘চিলড্রেন আস্ক কালাম’, তেমনই লিখেছেন ‘দ্য লাইফ ট্রি’র মতো কবিতার বই, যে-বইয়ে আছে গভীর দেশচেতনা। নানা ভাষার, নানা জাতির, নানা ধর্মের সহাবস্থান আমাদের দেশে। বাঙালি কবি যেমন লিখেছিলেন— বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তেমনই কালামের কবিতায় আছে সেই মিলনের কথা। আছে গভীর দেশাত্মবোধ, ভালোবাসা আর বিশ্বাস। আছে মাতৃভূমি আর ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠতা।

তিনি বলেছেন, সফল নেতারা কখনো সমস্যার কাছে হেরে যায় না। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমস্যা দূর করে। তাঁর আর-একটা অমর বাণী: কেবল সেই মানুষটিই মহাসাগর আবিষ্কার করতে পারে, তীরভূমির সঙ্গে সংযোগ হারানোর সাহস যার আছে।

শৈশবের দিনগুলি

সেলিম মল্লিক

একজন আধুনিক ভারতীয় মনীষীকে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বাড়ির কথা জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেছিলেন, আমার সব কথাই বাড়ির কথা। আপাত সামান্য এই কথাটির ব্যঞ্জনা সুদূর এবং গভীর। বাড়ি হল সেই জিনিস, শিশুর জীবনে যার প্রভাব, তার মাকে বাদ দিলে, সবচাইতে সূক্ষ্ম নিবিড় এবং শেষদিন পর্যন্ত প্রসারিত। শৈশবের কেন্দ্রে বাড়ির অবস্থান এবং এর চারপাশের বিস্তৃত ক্ষেত্রের অবদান জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অনুভূত হয়, মনে ও মননে তাদের রেখাপাত স্পষ্ট ধরা পড়ে। অন্তত সাবেকি জীবনধারার মধ্যে জন্মানো উত্তরাধিকারসূত্র ধরে থাকা মানুষজনের বেলা এই ধারণা সর্বাংশে সত্য। আবদুল কালামের ছোটোবেলা নিয়ে লিখতে বসে ওপরের বাক্যগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা হয়ে গেল।

কালাম নিজের জীবনকথা বলতে গিয়ে, প্রথমে দ্বিধান্বিত ছিলেন তাঁর অতি সাধারণ, অন্যের জানতে তেমন আগ্রহ জন্মানোর মতো বর্ণনার অযোগ্য শৈশবের বিবরণ প্রসঙ্গে। কিন্তু পরক্ষণেই সত্তার আলোড়নে তিনি উচ্চারণ করেছেন: শৈশব আমার চোখে অতি মূল্যবান। তথাকথিত উল্লেখযোগ্যতার প্রশ্নে, সত্যিই তাঁর শিশুকাল সেরকম কিছু না, তাতে না-আছে বৈভব না-আছে আতিশয্য না-আছে রোমাঞ্চ। তবু তিনি, স্বয়ং কালাম, শেষ পর্যন্ত জীবনের সমগ্রতার বিবেচনায় অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন নিজের শৈশবকে।

প্রতিটি ব্যর্থতায় শৈশবে ফিরে গিয়ে সান্ত্বনা খুঁজেছেন, প্রতিটি সাফল্যে শৈশবের ভূমিকা স্বীকার করেছেন।

তাঁর প্রপিতামহ আবুল, পিতামহ পাকির, পিতা জয়নুল আবেদিন— তিনি আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম। মায়ের নাম আশিয়াম্মা। জন্ম ১৯৩১ সালে তামিলনাড়ুর (পূর্বতন মাদ্রাজ) রামানাথপুরম জেলার ছোট্ট একটি পৌরশহর রামেশ্বরমে। রামেশ্বরম আসলে পাম্বান দ্বীপে অবস্থিত, কিন্তু জনশ্রুতিতে রামেশ্বরম দ্বীপ হিসেবেই প্রসিদ্ধ। সনাতন হিন্দুদের কাছে এই রামেশ্বরম পবিত্র এক তীর্থ, চার ধামের অন্যতম। দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব এবং শিব উপাসকদের অতি বিশিষ্ট পরম্পরা এখানে বর্তমান, তার উত্তরাধিকার রামেশ্বরমের জনমানুষের চরিত্রে নিহিত। এই চারিত্রিকতা ধর্মীয় দিক দিয়ে যত-না গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যময় বিশ্বাস নৈতিকতা আধ্যাত্মিক বোধের কারণে। আবদুল কালামের শৈশবে এর প্রভাব তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।

রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে কালামের পৈতৃক বাড়ি, তা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইট ও চুনাপাথর দিয়ে বানানো, আকারে বেশ বড়োসড়ো। বাবা পেশায় মৎস্যজীবী। নিজেদের পাকা বাড়ি, বাবার উপার্জন— হিসেবমতো তত দারিদ্র্য থাকার কথা নয়। অথচ কালামের শৈশবের অসচ্ছলতা প্রবাদপ্রতিম। কারণ হয়তো তাঁর মায়ের একটি মহানুভবতা। আশিয়াম্মা প্রতিদিন নিজের ছেলেপুলের সঙ্গে বাইরের বহু মানুষকে রান্না করে খাওয়াতেন এবং তার পরিমাণ বাড়ির লোকসংখ্যার চাইতে বেশি। ফলে সংসারে টান পড়ত। অভাবের মধ্যে অতি শৈশবে মায়ের ওই অন্নপূর্ণার স্বভাব কালামের অন্তরে এমন এক স্নেহ-মমতার ছবি এঁকে দিয়েছিল, যা তাঁর পরিণত বয়সে অসহায় মানুষের সঙ্গে হার্দ্য আচরণে অবিরলভাবে প্রকাশ পেতে পেরেছে। তাই আক্ষরিক অর্থে আবদুল কালামের মা এক আদর্শ সহায়িকা। তিনি সে-ই মা, যাঁর গুণের সহায়ে সন্তান মহাগুণান্বিত হয়ে ওঠেন। বলে রাখি, ছাত্রজীবনে কালাম যে নিরামিষাশী হলেন, তা আসলে ব্যয়সংকোচের দরুন।

সম্ভবত বাবার জীবনাদর্শের ছাপ কালামের ওপর প্রবলতম। বাবা জয়নুল আবেদিনের প্রথাগত শিক্ষা

ছিল না, পুঁজি আর সম্পত্তি তো থাকবার কথাই নয়। কিন্তু প্রাচীন সাধারণ ভারতবর্ষীয়দিগের থাকত এমন এক সহজাত প্রজ্ঞা, যা তাঁরা অর্জন করতেন এখানকার মাটি গাছপালা জীবনচর্যা আর সুস্থির সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে। বলা বাহুল্য, জয়নুল আবেদিনের ছিল ওইরকম চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব। দীনতা অন্তিম গুণ: বাবার কঠোর সংযমী বিলাসব্যসনপরিত্যাগী সাদামাটা জীবনযাপন সেই শৈশবে কালামের মধ্যে ও-জিনিস সঞ্চারিত করেছিল। নইলে কি তিনি অতি উচ্চ আধিকারিকের চাকরি করবার পরেও থাকতে পারতেন দশ ফুট চওড়া বারো ফুট লম্বা একটি ঘরে, যার সাজসজ্জা বলতে কিছু বইপত্র আর ভাড়াকরা কয়েকটি আসবাব। আটপৌরে পোশাকে পায়ে স্লিপার পরেই, রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল বাদ দিলে, প্রায় গোটা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ-বস্তু শৈশবে পিতার ভাবাবেশ গ্রহণের অভিজ্ঞান, তাঁর আত্মজীবনীর সাক্ষে এমনটাই প্রতিপন্ন হয়। প্রধানত মুসলমান-অধ্যুষিত তাঁদের পাড়ার যে-মসজিদ, ছবি দেখে যতটা বুঝতে পারা যায়, তা প্রাচীর-ঘেরা গাছপালা আচ্ছাদিত টালির চালার ছোটো প্রার্থনার ঘর। এই ধরনের এক নিভৃত নামাজের ঘরে ছেলেবেলার প্রতি সন্ধ্যায় কালামকে তাঁর বাবা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে প্রার্থনার জন্য নিয়ে যেতেন। আরবি ভাষায় উচ্চারিত সে-প্রার্থনার অর্থ কালাম সেদিন বুঝতেন না, কিন্তু নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতেন, তা আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে পৌঁছোত। তিনি তখন একটা ঘটনা খুব লক্ষ করতেন, নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর বাবা, বাইরে অপেক্ষা করা বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষদের জল পড়ে দিতেন, বিশ্বাসের মূল্য দিয়ে তাঁরা তা নিয়ে যেতেন বাড়িতে, রোগীর আরোগ্যের শক্তি হিসেবে। দরিদ্র অসহায় মানুষদের অন্তরে আশার বল জোগাতে জয়নুল আবেদিন এ-কাজ করলেও, নিজের সন্তানকে অমন পন্থা অনুসরণের চাইতে গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়েছিলেন: অদৃষ্টের চিন্তায় সন্ত্রস্ত হওয়া নয়, আকাঙ্ক্ষাপূর্তির পথ রোধ করেছে যে-শত্রু, নিজেদের মধ্যে তাকে অনুসন্ধান করার মতো দৃষ্টি লাভ করা প্রয়োজন। বাল্যের দিনগুলোতে কালামকে তাঁর বাবা সহজ সরল ঘরোয়া ভাষায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বোঝাতেন। তখনই কালাম বাবার চৈতন্যের সংস্পর্শে উপনীত

হয়েছিলেন এই ধারণাতে, মানুষের অবস্থান এবং বিকাশ আসলে সমগ্র ঐশ্বরিক সত্তার এক বিশিষ্ট অংশ। শিশু-কালামের অন্তর যে প্রতিনিয়ত এক ভক্তিনিবিড় পরিসরে লালিত হয়েছে, সে তো তাঁর জবানিতেই পাই: আমার চিরদিন মনে থাকবে, নামাজের আজান যখন শুনতাম, আমাদের বাড়ি একটি ছোটো মসজিদে রূপান্তরিত হত। আমার বাবা আর মা নেতৃত্ব দিতেন, আমরা সবাই তাঁদের অনুসরণ করতাম।

দীর্ঘ চুরাশি বছরের জীবনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে কালাম, তাঁর বাবাকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও চেতনার মূল শৈশবের ভূমিতে প্রোথিত। তখন তাঁর বাবা তাঁর কাছে যে গভীর সত্যের উদ্ঘাটন করেছিলেন, তা-ই ভবিষ্যতে তাঁর চলার পাথেয় হয়েছে। তা-ই দিয়ে নিজেকে

গড়েপিটে তৈরি করেছেন। সব সময় ব্যস্ত থেকেছেন নিজেকে সংস্কৃত করতে, বিশুদ্ধ করতে, বিকশিত করতে। এই প্রতিজ্ঞাই তাঁর পরিণত কালে ব্যক্ত হয়েছে প্রত্যয়ীর অকপট ভাষায়: জীবনের খেলা সহজ নয়। সে-খেলায় জিততে হলে ব্যক্তিগত হিসেবে নিজের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত যে-অধিকার, তাকে খোয়ালে চলবে না। কালাম দেখতেন, বাবার দিন শুরু হত ভোরের আলো ফুটবার আগে, প্রার্থনার ভিতর দিয়ে। এমনটা আমরা অনেকেই দেখি, কিন্তু কালাম শিশুর চোখ দিয়ে দেখার অতিরিক্ত দর্শন অঙ্গীকার করেছিলেন।

মানুষের সবচাইতে বড়ো কাজ এবং পবিত্রতম কর্তব্য হল নিজেকে আবিষ্কার করা, নিজের ভেতরের অব্যক্ত অন্ধকারে পড়ে থাকা প্রদীপটিকে চৈতন্যের আলোর স্পর্শে অনির্বাণ করে জ্বালিয়ে তোলা। একমাত্র এর সাহায্যেই মানুষ পূর্ণতার দিকে যেতে পারে। এই তত্ত্ববোধ বালক বয়সেই কালামের আত্মীকৃত হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাবা যে বলেছিলেন: অন্যদের যে জানে সে পণ্ডিত, কিন্তু জ্ঞানী হল সেই, যে নিজেকে জানে। জ্ঞান না থাকলে বিদ্যায় কোনো কাজ হয় না। এ তো সেই ভারতীয় প্রজ্ঞান— আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জানো। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এতেই সমর্পিত ছিল তাঁর অন্তর।

ছেলেবেলায় কালাম মায়ের সঙ্গে বসে খেতে খুব ভালোবাসতেন। রান্নাঘরের মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসতেন তিনি, আশিয়াম্মা সামনে একটি কলা পাতা বিছিয়ে, তাতে ভাত ও সুগন্ধী সম্বর ঢেলে দিতেন, দিতেন ঘরে বানানো ঝাল আচার এবং নারকোলের চাটনি। এরকম একটি খাবার পরিবেশন এবং পাত পেড়ে খাওয়ার ছবি তাঁর শৈশবস্মৃতির প্রিয়তম রোমন্থন। এই দৃশ্যপটের

অন্তরালে আশিয়াম্মা ও কালামের মধ্যে যে চিরন্তন মা আর সন্তানের দেখা মেলে, তা সম্ভবত আমাদের সনাতন পরিবারতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ-ক্ষেত্রে অপত্যের প্রভায় সন্তানের সার্বিক স্বাস্থ্য চূড়ান্তরূপে বৃদ্ধির সুযোগ পায়। আশিয়াম্মার সংসারে কালামের শৈশবে এই জিনিস ছিল সহজাত। তাই অনেক মহার্ঘ খাবারদাবার থাকা সত্ত্বেও, মায়ের হাতে বানানো দক্ষিণ ভারতীয় মিষ্টি পোলির আকর্ষণে বাইরে পড়ার সময়ে তাঁকে প্রায় উতলা করত মায়ের হেঁশেল।

সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদের পরিমণ্ডল নয়, ছেলেবেলায় তিনি পেয়েছিলেন প্রীতিপূর্ণ সম্মীলনের ভাবময় পরিবেশ। পরবর্তী জীবনে বিবিধ ধর্মের মৌলিক প্রেরণার সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় তাঁর যে বিপুল সামর্থ্য দেখেছি, অমন মহত্তর সংহতি-লাভের জন্য ওই পরিবেশের কাছে তাঁর মহৎ ঋণ থেকে গেছে। এমনিতেই রামেশ্বরম জায়গাটা প্রকৃতিলীন। এখানকার প্রকৃতি এমন এক অসীমার সুর মাটিতে নামিয়ে এনেছে, যাতে করে অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের সংগীত বয়ে বেড়ায় বাতাসে। সমুদ্রের বিশালতার সাহচর্যে সে-জিনিস অপার্থিব সৌন্দর্য পেয়েছে, ভাবতে ভালো লাগে।

রামেশ্বরম মন্দিরের বড়ো পুরোহিত পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী কালামের বাবার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তাঁরা দু-জনে নিবিড় সহমর্মিতায় আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। সেই নিমগ্ন আলাপচারিতা শিশু-কালামের মনোযোগ এড়িয়ে যেত না। ছবিতে দেখতে পাই জয়নুল আবেদিনের একমুখ দাড়ি, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে পাঞ্জাবি পরা মুসলমানি ভাবচ্ছবি এবং পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর মুণ্ডিত মস্তক, গলায় তুলসীর মালা, গায়ে গেরিমাটির তিলক, কাঁধে পাট করে রাখা নামাবলি আর ধুতিপরা পরম বৈষ্ণবীয় ভাবমূর্তি। অথচ অন্তরের ঐক্যে তাঁরা একীভূত। পক্ষী লক্ষ্মণের ছেলে রামনাথ শাস্ত্রী ছিলেন কালামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যেমন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু অরবিন্দন এবং শিবপ্রকাশনের মতো রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। রামেশ্বরমের এলিমেন্টারি স্কুলে যখন কালাম পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, তখন একটা ঘটনা ঘটল। মাথায় টুপি দেওয়া কালাম বসতেন প্রথম বেঞ্চিতে গায়ে নামাবলি জড়ানো রামনাথ শাস্ত্রীর পাশে। একদিন এক নতুন শিক্ষক ক্লাসে ঢুকে হিন্দু পুরোহিতের

সন্তান আর বিত্তকৌলিন্যহীন মুসলমানের ছেলে এক বেঞ্চিতে বসেছে দেখে নিজের সংস্কারের জেরে তা মানতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টিগত সামাজিক মর্যাদার নিরিখে তিনি কালামকে পেছনের বেঞ্চিতে বসবার নির্দেশ দেন। কালাম উঠে গিয়ে পেছনে বসলেন। এই ঘটনার মর্মভেদী প্রভাবে রামনাথের অন্তরের কান্না চোখের জল হয়ে উপচে পড়েছিল। সে-দিনের ওই কান্নার দৃশ্য দুঃখের পীড়নের বদলে কালামকে সাহায্য করেছিল গন্ডিবিহীন ভালোবাসার মর্ম বুঝতে। পরে জানতে পেরে পক্ষী লক্ষ্মণও সেই শিক্ষককে তিরস্কার করতে, এমনকী ক্ষমা না-চাইলে দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিতে ছাড়েননি। সুখের কথা, শিক্ষক মহাশয় অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজেকে শুধরে নিয়েছিলেন।

পনেরো বছরের বয়সের তফাত, তবু আমেদ জালালুদ্দিন কালামের বাল্যের ঘনিষ্ঠ সহচর বন্ধু, পরে এই জালালুদ্দিন তাঁর বোন জোহ্‌রাকে বিয়ে করেছিলেন। কালাম যখন ছ-বছর বয়সের, কৈশোর-উত্তীর্ণ জালালুদ্দিন তখন কালামের বাবার একটি নৌকা তৈরির উদ্যোগের সহযোগী, যে-নৌকা বেশ কিছু কাল রামেশ্বরম থেকে ধনুষ্কোডি তীর্থযাত্রী বহন করেছে। যাত্রী-পারাপারের ব্যাবসার সুসময়ে একদিন দুরন্ত সাইক্লোন এসে নৌকা উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে-বারের ঝড়ে যাত্রী-বোঝাই ট্রেনসমেত পাম্বান সেতুও ভেঙে পড়ে। সমুদ্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধ কালাম এবার তার দুর্দমনীয় শক্তিতে স্তব্ধ। আকস্মিক স্তব্ধতা অন্তরে এমন এক সম্পদ এনে দেয়, যাকে হয়তো অনেক ক্ষতির মূল্যে কিনতে হয়। নৌকার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তারপর থেকে জালালুদ্দিনের সঙ্গে অপার বন্ধুতায়, তদ্‌গত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রতিটি সন্ধ্যে বেলা। মস্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে তাঁরা বালুকাময় সমুদ্রবেলাতে হাঁটতে হাঁটতে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। কথা বলতে বলতে প্রায় যেতেন রামেশ্বরমের প্রসিদ্ধ শিবমন্দিরের চত্বরে। ওই মাত্র ছ-বছর বয়সে, কালাম জানাচ্ছেন, 'দেশের দূর দূরান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের মতো একইরকম সম্ভ্রম-সহকারে আমরা যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করতাম, অনুভব করতাম, একটি শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে।' কথায় বলে না, সাধু হওয়া যায় না, যে সাধু সে সাধু হয়েই জন্মায়। অতি

শৈশবে যাঁর অমন অনুভূতি, তাঁর প্রসঙ্গে এই প্রবচন যথার্থ। ভাবছি, জালালুদ্দিনও কেমন আত্মদীপবান উচ্চকোটির মানুষ, চিনেছিলেন অঙ্কুরিত কালামকে, সত্যিকারের গুরু যেমন প্রতিভাধর শিষ্যকে চিনতে পারেন। তিনিই প্রথম কালামকে জানিয়েছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সমসাময়িক সাহিত্য আর চেনাজানা সংকীর্ণ পরিধির বাইরের বিস্মিত হওয়ার মতো বিপুল পৃথিবীর কথা। কিন্তু ওসব সম্যকরূপে জানতে গেলে প্রচুর পড়াশোনা চাই, তার জন্য চাই অনেক বইপত্র। যে-ধরনের নীচুতলার সমাজ-পরিবারে কালামের বাস, তাতে বই বিরল বস্তু হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে তাঁর ভাই মুস্তাফার বন্ধু এস. টি. আর. মণিক্কমের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল ভালো রকমের বড়ো। মণিক্কম তখন কালামকে, আরও আরও, যত বেশি পড়া যায়, পড়ে যেতে উৎসাহ দিতেন। নিজের সংগ্রহ থেকে বই জুগিয়ে গেছেন দিনের পর দিন।

আরেক জন সামসুদ্দিন, কোনো এক সম্পর্কে কালামের ভাই, বাল্যকালে কালামের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক খুব বাস্তবিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সামসুদ্দিন ছিলেন রামেশ্বরমবাসীদের কাছে খবরকাগজ সরবরাহের একমাত্র এজেন্ট। তখন কালামের বয়স আট বছর। খবরের প্রসঙ্গ তেমন না-বুঝলেও কালাম কাগজে ছাপা ছবিগুলো খুব উৎসাহ নিয়ে দেখতেন। তা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে, ভারত মিত্র শক্তির সঙ্গে যোগ দিলে, জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি হয়, এবং রামেশ্বরম স্টেশনে ট্রেন থামা বন্ধ হয়ে যায়।

ফলে রামেশ্বরম ও ধনুষ্কোডির মাঝের স্টেশন রামেশ্বরম রোডের প্ল্যাটফর্মে খবরকাগজের বান্ডিলগুলো চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হত এবং রোজ সকালে তা ধরে নেওয়ার কাজটি পেয়ে, জীবনে প্রথম, মাত্র আট বছর বয়সে উপার্জন শুরু করেন কালাম। এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে, সেই সময়ে খবরকাগজে বেরোনো যুদ্ধের গল্প অবশ্য কালামকে শোনাতেন জালালুদ্দিন। আশ্চর্যের বিষয়, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কী এক কারণে বাজারে চাহিদা তৈরি হয়েছিল তেঁতুল-বিচির, তেঁতুলের বীজ জোগাড় করে মস্ক স্ট্রিটের দোকানে বিক্রি করে কালাম এক দিনে অন্তত এক আনা আয় করতেন। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে স্কুল-পড়ুয়া এক অতি বালকের দৈনিক এক আনা রোজগার নিতান্ত কম নয়। তা বাদেও, রামেশ্বরমের রেল স্টেশন রোডে ছিল তাঁর বড়োভাই মুস্তাফা কামালের মুদিখানা আর ছোটোভাই কাশিম মোহম্মদের হস্তশিল্প বিক্রির ছোট্ট দোকান। মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলেই বালক কালাম ওই দুটোতে দোকানদারি করতেন।

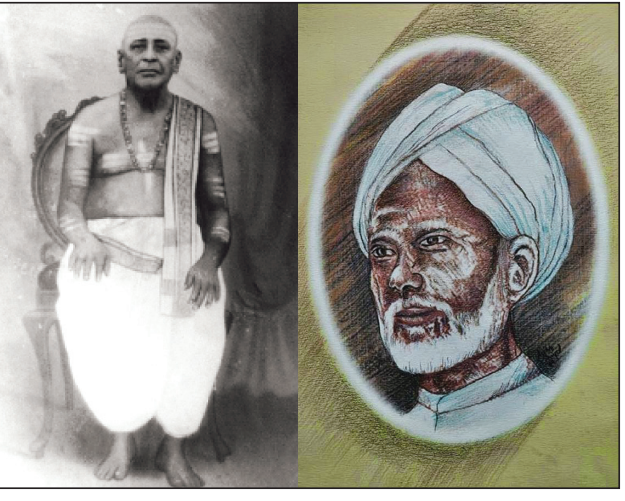

এতক্ষণ যেসব প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গের নির্ভরে কালামের শৈশবের দিনগুলি সম্বন্ধে কিছুদূর ধারণা করতে পারছি, তার সঙ্গে মাতৃকার মতো লিপ্ত হয়ে ছিল তামিল ভাষা। তামিল কালামের মাতৃভাষা। এ-ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস তাঁর আশৈশব গৌরবের উচ্চারণ। এ-ভাষাতে তাঁর হাতে-খড়ি, শিক্ষার বাহন এই ভাষা।

মনীষীদের জীবনকথা আর প্রাচীন ভারতীয় আখ্যান শুনতে শুনতে রাত্রির ঘুম নামে যে-শিশুর চোখে, বাবার সাধুতা আর মায়ের সংবেদনশীল অন্তরের কল্পতরুতলে যে-বালকের বয়ঃবৃদ্ধি, পাখির উড়ান দেখতে দেখতে যাঁর আকাশে উড়বার স্বপ্ন দেখা, জালালুদ্দিন ও সামসুদ্দিনের বন্ধুতায় যাঁর কৈশোরক জীবন অতিবাহিত, ইয়াদুরাই সলোমনের শিক্ষকতায় যাঁর শিক্ষার বুনিয়াদ গড়া, রামেশ্বরমের ভূমি ও আকাশ যাঁর কচি মনে প্রশান্তি ও গভীরতার আকাঙ্ক্ষা এঁকে দেয়, ঘরোয়া তামিলে যাঁর কাঁচা সবুজ অন্তরের কথাগুলি ধ্বনি পায়— এই সবকিছু পশ্চাৎপটে রেখে তাঁকে এবার পাড়ি দিতে হবে অন্য কোথাও ভিন্ন কোনোখানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন, বাতাসে মুখরিত হয়ে উঠছে গান্ধীর সেই উদ্দীপ্ত ঘোষণা: ভারতীয়রা নিজেদের ভারত নিজেরা গড়বে। তাই শৈশব আর বাল্য-উত্তীর্ণ কালামকেও রামেশ্বরম ছেড়ে পরবর্তী শিক্ষার জন্য পাড়ি দিতে হল জেলাসদর রামনাথপুরমে। কারণ, সবার অলক্ষে সেদিন বিধাতা যে কালামের ললাটে এঁকে দিয়েছিলেন অনাগত ভারত গড়ার আশীর্বাদী টিকা। আর তিনি পরবর্তী কালে সাফল্যের সঙ্গে করেওছেন সে-কাজ। তবু সেসবের জন্য নয়, তাঁর শৈশবের অমল দিনগুলির কথা ভেবে খানিক সুখ অনুভূত হল।

কালাম যখন ছাত্র

জাভেদ ইকবাল

সময় সবেমাত্র চল্লিশের দশকে পা রেখেছে। বিশ্বজুড়ে তোলপাড়। সমগ্র বিশ্বের মানুষকে জার্মান আর্যদের পদতলে করতে হিটলারের আগ্রাসী ভূমিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর প্রভাব সারাবিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের মানুষের ওপরেও পড়েছিল। রামেশ্বরমের আট বছরের ছোট্ট ছেলেটিকে নিজের পড়াশুনোর খরচ নিজেকেই বহন করতে হত তুতোভাইয়ের সঙ্গে খবরের কাগজ বিক্রি করে। সেই সময় গোটা বিশ্বের সঙ্গে আর্থিক সংকটের শিকার আমাদের ভারতও। হঠাৎ বাজারে তেঁতুল বীজের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্কটা রামেশ্বরমের আট বছরের ছেলেটি তখন বুঝতে পারেনি আর ওই বয়সে বোঝার কথাও নয়। সাধারণ মানুষ তখনই প্রত্যক্ষ করলেন, যখন ইংরেজশাসিত ভারত মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করায় দেশে জরুরি অবস্থা জারি হল। যার আর-এক ফল

রামেশ্বরম স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানো বন্ধ। সুতরাং ভোর বেলায় চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে দেওয়া খবরের কাগজের বান্ডিল লুফে নিয়ে সেই অষ্টমবর্ষীয় বালকের গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে পুনরায় গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বকেয়া পয়সা আদায় করে ভাইয়ের সঙ্গে সন্ধ্যে বেলায় সমুদ্রতটে 'দিনমণি' পত্রিকা খুলে যুদ্ধের খবরাখবর নেওয়া এবং খবরের কাগজ পড়ে সেই ছেলেটির বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখা। মাদ্রাজ বোম্বাই কলকাতা যাওয়ার স্বপ্ন, যদি ভাগ্যক্রমে কোনো দেশপ্রেমী নেতৃত্বের দেখা মেলে! সহোদর এবং তুতোভাই-বোনেদের মধ্যে অঙ্কের প্রতি সবথেকে বেশি আগ্রহ আর মাথা থাকায় বাবা তার জন্য অঙ্কের শিক্ষকও নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এতই কি সোজা? শিক্ষক পেলে কী হবে, আছে তাঁর এক ভয়ংকর শর্ত। শিক্ষকের সাহচর্য পেতে হলে তাকে স্নান সেরে সূর্য ওঠার অনেক আগেই পৌঁছোতে হবে শিক্ষকের বাড়ি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন যখন সেই অষ্টমবর্ষীয় বালকের চোখে, তখন এ আর এমনকী! প্রতিদিন মায়ের ডাকে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে এক-ছুটে শিক্ষকের বাড়ি, সেখান থেকে এক ঘণ্টা অঙ্ক কষে যখন বাড়ি ফিরত তখন ঘড়ির কাঁটা ভোর পাঁচটাতে। এরপর তাকে আবার ছুটতে হবে স্টেশনে কাগজের বান্ডিল লুফতে।

সেই ছেলেটিই ২০০২ সালে ভারতের সেই সময়কার প্রায় একশো কুড়ি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে একাদশতম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনিই আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম।

ছাত্র হিসেবে কালাম নিতান্তই সাধারণ ছিলেন। কিন্তু কঠোর অধ্যবসায় আর অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা নিজেকে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। সমাজতন্ত্রী স্তালিনের লাল ফৌজের সামনে হিটলার নতজানু। নির্লজ্জভাবে আমেরিকার অ্যাটম বোমার প্রথম প্রয়োগ এবং লক্ষাধিক মানুষ পুড়ে ছাই। একষট্টিটি দেশের সক্রিয় যোগদানে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের মৃত্যু, চার কোটি মানুষের ক্ষতবিক্ষত দেহ। হিটলারকে না থামালে সংখ্যাটা হয়তো আরও বেশি হত। এদিকে ভারতে স্বাধীনতা আসন্ন। ভারতবাসী এবার তাদের নিজস্ব ভারত গড়বে বলে গান্ধীজির দীপ্ত

ঘোষণা। ভারতবাসীর মনের মধ্যে তখন অভূতপূর্ব আশা— এবার পরাধীনতা থেকে মুক্তি অর্থাৎ খাওয়া পরা থাকার জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। এবার তবে চাষিবাড়ির ছেলেটিও বড়োলোকের ছেলের মতো স্কুলে যেতে পারবে। ঠিক সেই সময় বাবার কাছে গ্রাম ছেড়ে জেলাসদর রামনাথপুরমে পড়াশুনোর জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কালাম। চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও ছেলের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে বাবা বলেন, কালামকে মানুষের মতো মানুষ হতে হলে ভিটেমাটি ছাড়তেই হবে। কিন্তু কালামের মা নারাজ। ছেলেকে চোখের আড়াল করতে চান না। কালামের বাবা জানতেন এবং মানতেন, সন্তান মা-বাবার আবেগ হলেও মা-বাবার সিদ্ধান্ত কখনো সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় এবং ছেলেকে মানুষ করতে তিনি তাঁর এই ভাবনা কালামের মাকেও বোঝাতে পেরেছিলেন।

সুতরাং কাগজ বিক্রির সঙ্গী তুতোভাই সামসুদ্দিন আর বন্ধু (পরবর্তী কালে ভগ্নীপতি) আমেদ জালালুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে রামনাথপুরমে সোয়ার্জ হাই স্কুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং সেখানেই হস্টেল-জীবন শুরু। পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা-বিশিষ্ট এই শহর উন্নত হলেও সম্প্রীতির বড়ো অভাব ছিল। তাই গ্রামের মানুষের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা কালামের ভীষণ মনে পড়ত এবং বাড়ি যাওয়ার কোনো সুযোগই তিনি ছাড়তেন না। তা ছাড়া লেখাপড়ার প্রতি অদম্য ভালোবাসা থাকলেও মায়ের হাতের তৈরি বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্বাদযুক্ত বারো রকমের পোলি (দক্ষিণ ভারতীয় মিষ্টি) হস্টেলে থেকে পড়াশুনোর ইচ্ছাকেও মাঝেমধ্যে হার মানাত। বাড়ি যাওয়ার সমস্ত কৌশল অবশ্য কালাম ছাড়াও হস্টেলের সবাই ভালোভাবেই রপ্ত করেছিল। প্রথম-প্রথম কালামের মন পড়ে থাকত সেই ছোট্ট রামেশ্বরমে। অথচ বাবার স্বপ্ন ছেলেকে সরকারি আমলা বানানোর। তাই বাড়ির টান কাটাতে জালালুদ্দিনের পরামর্শ অনুযায়ী কালাম সর্বদা ইতিবাচক চিন্তা করতেন। ক্লাসরুমে পাখা না থাকায় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম আর আর্দ্রতার জন্য স্কুলের ক্লাস বসত গাছের তলায়, ঠিক শান্তিনিকেতনের মতো। সোয়ার্জ হাই স্কুলে নিজেকে ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে ইয়াদুরাই সলোমন হয়ে উঠলেন তাঁর আদর্শ। ছাত্রদের আকৃষ্ট করা মুক্তমনা স্বভাবের এই শিক্ষকের কাছ থেকে

কালাম শিখেছিলেন, ‘একজন খারাপ ছাত্র একজন ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে যতটা না শিখতে পারে, একজন ভালো ছাত্র একজন খারাপ শিক্ষকের কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি শিখতে পারে।’ কালামের স্বভাব এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা, তার সঙ্গে ইয়াদুরাই মশাইয়ের ব্যবহারের জন্য দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কেবলমাত্র গুরু-শিষ্যের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। জীবনে সফলতা পেতে হলে গুরু ইয়াদুরাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া ‘ইচ্ছা, বিশ্বাস, প্রত্যাশা’ — এই তিনটি মন্ত্রকে কালাম নিজের জীবনে ভীষণভাবে রপ্ত করেছিলেন। তিনি গুরুর কাছে আরও শিখেছিলেন, তীব্র প্রত্যাশা থাকলে নিশ্চিতরূপে প্রত্যাশিতকে অর্জন করা যায়।

একদিন তাড়াহুড়োয় ভুল করে অন্য শ্রেণিকক্ষে ঢুকে পড়ায় অঙ্কশিক্ষক রামকৃষ্ণ আইয়ার ঘাড় ধরে

কালামকে ক্লাসের সবার সামনে বেধড়ক বেত চালিয়েছিলেন। তারপর অনেক দিন বাদে কালাম অঙ্কে একশোয় একশো পাওয়ায় সেই শিক্ষকই অনুষ্ঠানে সবার সামনে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, যাকে তিনি একদিন বেত্রাঘাত করেছিলেন আজ সে তাঁর এবং স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

স্টেশন রোডে কালামের দাদা মুস্তাফা কামালের একটা দোকান ছিল। স্কুল থেকে ছুটিতে বাড়ি এলে কালামকে ঘণ্টা খানেকের জন্য দাদার সাহায্যার্থে দোকান সামলাতে হত।

সম্মানের সঙ্গে শুধু ভালো নম্বর নয়, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সোয়ার্জ হাই স্কুলের পড়াশুনো শেষ করে ১৯৫০ সালে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হলেন তিরুচিরাপল্লিতে সেন্ট জোসেফ কলেজে, যেটা ছিল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। কালাম তখন আঠারোতে পা দিয়েছেন। একশো জন ছাত্রের সঙ্গে কলেজের আবাসিক তিনতলা হস্টেলের একটি ঘরে এক হিন্দু গোঁড়া আইয়েঙ্গার (ব্রাহ্মণ) পরিবারের, আর-এক কেরলের খ্রিস্টান পরিবারের ছেলের সঙ্গে কালাম থাকতেন। তৃতীয় বর্ষে কালাম শাকাহারী মেসের সম্পাদক নিযুক্ত হলে, এক রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শিক্ষক ফাদার কালাথিলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে-দিন ছেলেদের পছন্দ অনুযায়ী নানান খাবার তৈরি হয়েছিল। ছাত্রদের সেই রাজকীয় খাবারের আয়োজন দেখে কালাথিল সাহেব তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চতুর্থ অর্থাৎ অন্তিম বর্ষে কালাম ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদও গ্রহণ করেছিলেন। তলস্তয়, স্কট এবং হার্ডলের মতো ক্লাসিক্যাল লেখকদের পড়ার পর দর্শনের দিকেও ঝুঁকেছিলেন। এইসময় পদার্থবিদ্যার প্রতিও তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। পদার্থবিদ্যার দুই শিক্ষক অধ্যাপক চিন্না দুরাই এবং অধ্যাপক কৃষ্ণমূর্তি পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা পড়ানোর সময় পরমাণুর অর্ধজীবন এবং পদার্থের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় বা রেডিয়ো-অ্যাকটিভ ডিকেই সম্পর্কে ধারণা দিতেন। কালাম জানতে পারলেন, অধিকাংশ পারমাণবিক কণাই অস্থির এবং নির্দিষ্ট সময় পর সেটির তেজস্ক্রিয় ক্ষয় হয়ে অন্য পারমাণবিক কণাতে পরিণত হয়। এই ধারণা অবশ্য গ্রামের স্কুলে বিজ্ঞান পড়ার সময় তাঁর ছিল না। সুতরাং সবকিছুই তাঁর কাছে প্রথম। সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মহাজাগতিক বস্তু সম্বন্ধীয় বই পড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ বেড়ে গেল।

ছেলেবেলা থেকে বিমানচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরও যেমন তিনি উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, তেমনই তাঁর কাছে ছিল না বিভিন্ন পেশা সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য। সুতরাং পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হবার পর তিনি অনুভব করলেন, পদার্থবিদ্যা নয়, অনেক আগেই অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটের পরই তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়া উচিত ছিল। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে দিক

পরিবর্তন করে ম্যাড্রাস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-তে ভর্তির জন্য আবেদন করলেন, যেটা সেই সময় দক্ষিণ ভারতের টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিখরে ছিল। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কী হবে, ভর্তি-ফি হাজার টাকা, যেটা তাঁর বাবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সেই সময় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বোন জোহ্‌রা। হাতের সোনার চুড়ি আর গলার চেন বন্ধক দিয়ে কালামকে এমআইটি-তে ভর্তি করিয়েছিলেন। কালামও ভেবেছিলেন নিজের উপার্জন করা অর্থ দিয়ে বোনের সোনা ফিরিয়ে আনবেন এবং যার একমাত্র উপায় কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একটা স্কলারশিপ জোগাড় করা।

এমনিতেই ছোটোবেলায় সিগাল পাখির উড়ে যাওয়া দেখে উড়োজাহাজের প্রতি এবং উড়োজাহাজ চালানোর প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল। তার ওপর এমআইটি-তে ভর্তি হয়েই দেখতে পেলেন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রদর্শনী হিসেবে রাখা দুটো বিমান। ক্লাস শেষে বাকি ছেলেরা হস্টেলে চলে গেলেও অনেক লম্বা সময় ধরে কালাম ওই বিমানদুটোর পাশে গিয়ে বসে থাকতেন, সেটার সমস্ত অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। এক বছর পরে দ্বিতীয় বর্ষে সিলেবাস অনুযায়ী যখন একটি অতিরিক্ত বিষয় বাছতে হল, কালাম তখন অনায়াসেই এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বেছে নিয়েছিলেন। এমআইটি-তে পড়ার সময় তিনজন শিক্ষক অধ্যাপক স্পনডার, অধ্যাপক কে এ ভি পাণ্ডালাই ও অধ্যাপক নরসিংহ কালামের চিন্তাভাবনার ওপর এবং কর্মজীবনের ভিত প্রস্তুত করতে বিরাট প্রভাব ফেলেছিলেন। অধ্যাপক স্পনডার ছিলেন অস্ট্রিয়ান, অভিজ্ঞ, বিশেষ করে ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতায় তুখোড়। পড়াতেন টেকনিক্যাল এয়ারোডাইনামিকস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসি বাহিনী স্পনডার সাহেবকে ধরে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি করে রেখেছিল। শান্ত, নরম মেজাজের স্পনডার সর্বদা নতুন টেকনোলজির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত রাখতেন আর বিদ্যার্থীদের কাছ থেকেও সেটা আশা করতেন। বিশেষ বিষয় হিসেবে এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বাছতে স্পনডার সাহেবের পরামর্শ নিতে যাওয়ায়, তিনি বলেছিলেন, ভারতীয়দের সমস্যা হল, বাজারের চাহিদার বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের পছন্দের বিষয়কে যুক্তি দিয়ে পার্থক্য করতে পারে না। আর সেই জন্যই

সাহিত্য বা ইতিহাসে অনুরাগ থাকলেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তারা বেছে নেয় কোনো প্রফেশনাল বিষয়।

মোশন এবং মুভমেন্টের মধ্যে এবং স্লাইড ও ফ্লো-র মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকলে খামোখা দুটি পৃথক শব্দ কেন তৈরি হতে যাবে? শিক্ষকদের দ্বারা এই শব্দগুলির পার্থক্য উদ্ঘাটনে প্রভাবিত হয়ে কালামের এয়ারোনটিক্স বিষয়টির ওপর আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। বিমান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে বিভিন্ন ধরনের বিমান— যেমন, দুই-পাখাযুক্ত বিমান, এক-পাখাযুক্ত বিমান, লেজবিহীন বিমান, ডেলটা বা ব বর্ণের মতো পাখাযুক্ত যুদ্ধবিমান ইত্যাদির গঠন ও তাৎপর্য নিয়ে ভাবা তাঁর অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়াল।

কোর্স ওয়ার্ক তখন শেষ। অধ্যাপক শ্রীনিবাসন কালামের ডিজাইন শিক্ষক ছাড়াও ছিলেন এমআইটি-র হেড। কালামসহ চার ছাত্রের একটি দলের ঘাড়ে প্রোজেক্ট হিসেবে পড়ল নিম্ন উচ্চতায় উড়তে পারা একটি যুদ্ধবিমান তৈরি করা। দলের নেতৃত্বে কালাম। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা অংশের ডিজাইনের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। কেউ প্রোপালশন তো কেউ স্ট্রাকচার, কারও ভাগ্যে কন্ট্রোল পড়ে তো কারও ইনস্ট্রুমেনটেশন পছন্দ। দিনের বেশিরভাগ সময় তাঁরা প্রোজেক্ট নিয়ে

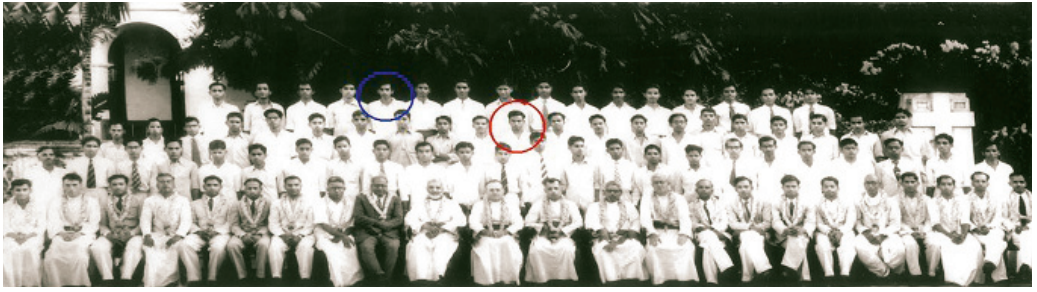

আলোচনা আর গবেষণায় ব্যস্ত। এক সপ্তাহ কঠিন পরিশ্রমের পর তৈরি ডিজাইন অধ্যাপকদের দেখিয়ে মন জয় করা তাঁদের আশা। সেই আশায় জল পড়ল, যখন অধ্যাপক শ্রীনিবাসন তাঁদের তৈরি প্রোজেক্টটাকে আরও নিখুঁত দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কালাম তখন দম বন্ধ করে অধ্যাপকের রায়ের অপেক্ষায় এক পাশে দাঁড়িয়ে। প্রোজেক্টের খাতাটা দেখার পর অধ্যাপক ভ্রূ কুঁচকে নাক সিটকে কঠোর দৃষ্টিতে কালামের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমার কাছে আরও ভালো কিছু আশা করি। আমি হতাশ যে, তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান এইরকম একটা বেদনাদায়ক কাজ নিয়ে আসবে।' লজ্জায় কালামের যেন মাটিতে মিশে যাওয়ার অবস্থা। বেশ কয়েক বার মাথা নেড়ে অধ্যাপক শ্রীনিবাসন কালামকে নতুনভাবে চিন্তা করে একদম গোড়া থেকে সম্পূর্ণ প্রোজেক্টটাকে পুনরায় ডিজাইন করার আদেশ দিলেন এবং কালাম সেই আদেশ পালনে সম্মতি জানাতেই অধ্যাপক মহাশয় ফাটালেন দ্বিতীয় বোমা। কাজটা শুধু করলেই হবে না, তিন দিনের মধ্যে হওয়া চাই। নইলে স্কলারশিপ বন্ধ। স্কলারশিপ বন্ধ মানে পড়াশুনোয় ইতি, যেটা কোনোভাবেই হতে দেওয়া চলবে না। শেষ চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে। না খেয়ে সারারাত জেগে তাই কাজে মনোযোগ। কিন্তু কোনোমতেই পুরোনো চিত্রটা মাথা থেকে যেতে চায় না। বহু কষ্টে সেই মাকড়সার জালকে মাথা থেকে মুছে ফেলে নতুন ডিজাইন তৈরি করে দুই দিন পর সন্ধ্যায় শেষবারের মতো চোখ বোলানোর সময় কালাম অনুভব করলেন ঘরে একজনের উপস্থিতি। টেনিস খেলার

উর্দি পরে অধ্যাপক শ্রীনিবাসন দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হলে অধ্যাপক মহাশয় পাশে এসে মনোযোগ সহকারে নতুন ডিজাইন দেখে হেসে কালামের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'আমি জানি, সে-দিন তোমার কাজকে প্রত্যাখ্যান করে তোমাকে অনেক চাপে ফেলে দিয়েছিলাম এবং তিন দিনের অসম্ভব সীমাও টেনে দিয়েছিলাম। তবুও তুমি করে দেখিয়েছ। শিক্ষক হিসেবে আমার এই পদক্ষেপের জন্য তুমিও তোমার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছ।' অধ্যাপকের সেই কথাগুলো কালামের আত্মবিশ্বাসকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রোজেক্ট শেষে 'তামিল সংগম' নামে এমআইটি-র সাহিত্যসমাজের আয়োজিত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কালাম অংশগ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টের জন্মেরও পাঁচশো বছর আগের তামিল সাহিত্য ও ভাষা কালামকে গর্বিত করে। কালাম মনে করতেন, ভাষার বাইরে বিজ্ঞান বিস্তারলাভ করতে পারে না। 'আমাদের বায়ুযান আমরাই বানাব' নামক প্রবন্ধ তামিল ভাষায় লিখে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে 'আনন্দ বিকতন' নামক জনপ্রিয় সাপ্তাহিক তামিল পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের হাত থেকে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন।

এমআইটি-র অন্তিম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায়ী অনুষ্ঠানে তখন একসঙ্গে ছবি তোলার পালা। সামনের সারিতে চেয়ারে বসে সমস্ত অধ্যাপক, পিছনের তিনটি সারিতে বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কালাম। অধ্যাপক স্পনডার পিছন ফিরে কালামকে একদম সামনে তাঁর পাশে বসতে আমন্ত্রিত করায় কালাম তখন হতভম্ব। সবার সামনে কালামের প্রশংসা কালামকে অপ্রস্তুত করলেও শেষমেষ তিনি অধ্যাপক স্পনডারের সঙ্গে এক ফ্রেমেই ছিলেন।

এমআইটি-র পাঠ চুকিয়ে শিক্ষানবিশ হিসেবে হাতেকলমে জ্ঞান নিতে ব্যাঙ্গালোরে সরকারি সংস্থা হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)-এ যোগদান। সেখানে বিভিন্ন ইঞ্জিন ও তার বিভিন্ন ছোটো ছোটো অংশ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, উত্তেজনার সঙ্গে পিস্টন ও টারবাইন ইঞ্জিন খুলে পরীক্ষানিরীক্ষা, গ্যাসের গতিবিজ্ঞান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, ক্র্যাঙ্কশাফটের পরীক্ষা করা এবং তাতে পিস্টন লাগানোর পদ্ধতি

তিনি ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। হ্যালে থাকাকালীন যন্ত্রপ্রণালী এবং কার্যপ্রণালী ছাড়াও ইঞ্জিনের সমস্ত নাড়িনক্ষত্র ছিল তাঁর মাথায় ছবির মতো সাজানো।

হ্যালে কাজ করতে করতে হঠাৎ কালামের হাতে এসে পড়ে দুটো চাকরির সুযোগ। একটি ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে ডাইরেকটরেট অফ টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন অর্থাৎ ডিটিডি অ্যান্ড পি (এয়ার), অপরটি এয়ার ফোর্সের। সুযোগদুটোর মধ্যে এয়ার ফোর্সের দিকেই ঝোঁকটা বেশি। কারণ, এয়ার ফোর্সে চাকরি মানে উড়োজাহাজ চালানোর সুযোগ, যেটা দীর্ঘকাল ধরে দেখে আসা স্বপ্ন। দুটোর ইন্টারভিউ লেটার প্রায় একসঙ্গেই এসে হাজির। একটির ইন্টারভিউয়ের স্থান দিল্লি, অপরটির দেরাদুন। অর্থাৎ দু-হাজার কিলোমিটারের বেশি যাত্রাপথ, এতটা দূরের যাত্রা কালামের এই প্রথম।

দিল্লিতে এক সপ্তাহ থেকে ডিটিডি অ্যান্ড পি (এয়ার)-এর ইন্টারভিউ দিয়ে সোজা দেরাদুন এয়ার ফোর্সের ইন্টারভিউয়ের জন্য যাত্রা। যেখানে পঁচিশ জনের মধ্যে আট জন চাকরির জন্য বাছাই হয়েছিল, আর কালামের স্থান ছিল নবম। হতাশ কালাম সোজা চলে যান হৃষীকেশ, যেখানে গঙ্গাস্নান করে হাঁটা দেন পাহাড়ের চুড়োয় স্বামী শিবানন্দর আশ্রমে। সেখানে সাধুদের সঙ্গে ধ্যান করে স্বামী শিবানন্দর সাক্ষাৎ দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদ নেন। আবদুল কালাম তাঁর আত্মজীবনী 'উয়িংস অফ ফায়ারে' লিখেছেন, তিনি স্বামীজির আধ্যাত্মিক রূপ দেখে মুগ্ধ হন এবং স্বামীজির আশীর্বাদ-বচনে তাঁর হতাশা দূর হয়। যার জন্য তিনি যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের দ্বারা সমালোচিত হন যে, তিনি একজন দেশের সেরা বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও কী করে আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে হতাশা দূর করতে এবং ভবিষ্যৎ সফলতার জন্য আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, সময়টা তখন ১৯৫৮। ভারতবর্ষে নেহরু দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খাদ্যের জন্য হাহাকার। ঠিক সেই সময় সাতাশ বছর বয়সে নতুন উদ্যম নিয়ে কালাম দিল্লি ফিরে ডিটিডি অ্যান্ড পি (এয়ার) সংস্থায় আড়াইশো টাকার মাইনেতে সিনিয়র সায়েন্টিফিক

অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হন। বিমান চালানো হল না তো কী হয়েছে, বিমানকে আকাশে উড়তে হলে এই নতুন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্টের সাহায্য তো নিতেই হবে।

কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও জানার আগ্রহ তাঁর বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। বইপত্র থেকে তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতি থেকে ব্যাবহারিক জ্ঞান নিতে চোখ কান ছিল তাঁর সর্বদা খোলা। তাই তো সিগাল পাখির ওড়া দেখে বিমান চালানোর প্রতি নেশা। তাই তো এমআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখলেও, এই কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় সেই ছেলেবেলায় সমুদ্রতটে বাবার সঙ্গে নৌকা বানানোর সময় থেকে। সাতাশ বছর বয়সে কর্মজীবনে পা রাখলেও শিক্ষা অর্জনের প্রতি অতৃপ্ত তৃষ্ণা কালামের ছাত্র ও কর্মজীবনের মধ্যে কোনো দেয়াল তৈরি করতে পারেনি। তাই ডিআরডিও-ইসরো-নাসা-তে চাকরিরত অবস্থায় তিনি ছাত্রের মতো জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। এমনকী রাষ্ট্রপতি কালামকেও ছাত্র কালাম বলা চলে। ছাত্রজীবন তিনি এতটাই উপভোগ করেছিলেন, চুরাশি বছর বয়সেও, জীবনের শেষ সময়টিতে শিক্ষার্থীদের মাঝেই ছিলেন কালাম।

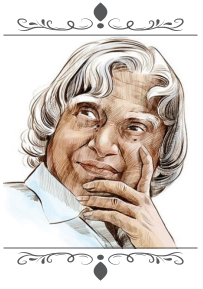

ভারতীয় হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ

অতনুমিথুন মণ্ডল

১৪ অগাস্ট ১৯৪৭-র মধ্যরাতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করলেন, 'At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.'। অর্থাৎ মধ্যরাত্রির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে যখন সকল পৃথিবী নিদ্রামগ্ন, ভারত জেগে উঠবে প্রাণ ও স্বাধীনতায়।

১৫ অগাস্ট ১৯৪৭-এর পরে ভারত এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হল, যে স্বাধীন। যার কর্মসূচি ও লক্ষ্যস্থাপন আর বিদেশি প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এর আগে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে বিদেশি ঔপনিবেশিক প্রভুরা। প্রভূত অত্যাচার করলেও তারা এ-দেশকে দিয়ে গিয়েছিল একটি সুদৃঢ় শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, যার অনুকরণ ও অনুসরণ আমরা আজও করছি। সেদিন ভারতীয় জাতির সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল কীভাবে তারা নবগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলবে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। পাশ্চাত্য লেখক বার্নাড শ, এইচ জি ওয়েলস, জে এম কেইনস, রাসেল প্রমুখর রচনার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্য মানবতাবাদী চিন্তন দ্বারা তিনি ছিলেন বহুলভাবে প্রভাবিত। এই অলোকপ্রাপ্ত মানুষটি বুঝলেন,

দীর্ঘ দুশো বছরের দাসত্বের শৃঙ্খলে জর্জরিত ও পঙ্গু এ-দেশকে উন্নত অগ্রগণ্য দেশগুলির মধ্যে স্থাপন করতে হলে দরকার শিল্পোন্নতি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গণতন্ত্রের চর্চা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠা। নির্ধারিত হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৫৬ সালে গঠিত হল আইআইটি-সমূহ ও গঠিত হল ইউজিসি, শিক্ষা বিস্তারের নির্দিষ্ট রূপরেখার জন্য গঠিত রাধাকৃষ্ণন কমিশন।

কিন্তু সেসময় দেশে বিজ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত থাকলেও ভারত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, মহাকাশ বিজ্ঞানের সমস্ত খাতে বরাদ্দ অনেক কম রাখত। মহাত্মা গান্ধী, মহামতি অশোকের দেশ শান্তির প্রতিনিধি। সেই দেশ কখনো অস্ত্র-প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়, অসির ঝনঝনিতে অংশগ্রহণ করবে না— এরকম একটি আদর্শ প্রচ্ছন্ন ছিল। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে না পাওয়া মানুষের দেশে মহাকাশবিজ্ঞানচর্চাকে মনে করা হল বিলাসিতা। ভারতের তৃতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও নেহরুর একান্ত সুহৃদ ভি কে কৃষ্ণমেননও ছিলেন এই ভাবনার পথিক। তিনি ও নেহরু ঘোষণা করেছিলেন জোট-নিরপেক্ষতা নীতির, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটিকে বিশ্বমঞ্চে একটু অন্য ভাবনার ভাবুক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল দু-জনের।

কিন্তু পরিস্থিতি বদলাল ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে, ভারতের শোচনীয় পরাজয়ে। চীনা বাহিনীর তুলনায় ভারতীয় সমরকৌশল, সমর পরিকল্পনা, সমরাস্ত্র সবই ছিল যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের। ভি কে মেনন পদত্যাগ করলেন, ভগ্নহৃদয় প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন দেশকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উন্নততর না করলে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ১৯৫৮ সালে গঠিত ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড

ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন) এবং ১৯৫৭ সালে গঠিত আইএনসিওএসপিএআর (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ)-কে নির্দেশ দিলেন নিজেদের কর্মসূচি ঢেলে সাজাতে। আইএনসিওএসপিএআর-এর প্রধান প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই একটি ভাষণে স্পষ্ট করলেন নিজেদের লক্ষ্য: 'There are some who question the relevance of space activities in a developing nation. To us, there is no ambiguity of purpose, we do not have the fantasy of competing with the economically advanced nations in the exploration of the moon or the planets or manned space flight. But we are convinced that if we are to play a meaningful role nationally, and in the community of nations, we must be second to none in the application of advanced technologies to the real problems of man and society.'

যখন দেশ অর্জন করতে চাইছে স্বকীয় বিজ্ঞানচর্চার গৌরব, দেশজ প্রযুক্তির জাগরণ— এরকমই এক সময়কালের পটভূমিকায় বিজ্ঞানচর্চার মৃগয়াক্ষেত্রে প্রবেশ আমাদের অলোচ্য প্রবন্ধের স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষটির। তাঁর বিশ্বাস ছিল— স্বপ্ন সেটা নয়, যা মানুষ ঘুমের মধ্যে দেখে; স্বপ্ন সেটাই, যা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না। এই স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষা, তার একান্ত অনুধ্যানই রামেশ্বরমের লোনা আবহাওয়ায় প্রতিফলিত একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল দেশের সর্বোচ্চ আসনটিতে। তিনি আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম। বাবা জয়নুল আবেদিন ছিলেন মৎস্যজীবী। মা আশিয়াম্মা গৃহবধূ। পরিবারের ছিল না প্রথাগত শিক্ষা। কিন্তু পিতার ছিল গভীর আধ্যাত্মিক মনন, তা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রোথিত কালামের অন্তরে। ফলে তিনি স্বভাবের দিক থেকে ভাবপ্রবণ মানুষ, তা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে আগ্রহ অনুভব করলেন ভারতীয় সমরাস্ত্র নির্মাণ প্রচেষ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটিতে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু আমরা যখন কালামের আত্মকথা 'উয়িংস অফ ফায়ারে'র ভূমিকা পড়ি, তখন দেখি ওই ভাবপ্রবণতা ও বিজ্ঞান-নিবেদনের মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থকতা নেই। ভাবপ্রবণ হওয়ার অর্থ আত্মদৌর্বল্য নয়, বরং আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা।

তিনি লিখেছেন, 'এই বই এমন একটা সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে, যখন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের নানা প্রচেষ্টা, যার উদ্দেশ্য তার নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা, তাকে নিয়ে পৃথিবীর অনেকেই প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করেছেন। মানুষ যে চিরকাল নানা বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করেছে, সে-কথা ইতিহাসই বলে। প্রাগৈতিহাসিক কালে লড়াই হত খাদ্য এবং বাসস্থান নিয়ে। কালক্রমে যুদ্ধ হতে লাগল ধর্মীয় ও মতাদর্শ নিয়ে, ধ্যান-ধারণা নিয়ে, আর এখন উন্নত ধরনের আধুনিক যুদ্ধের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য। তার ফলে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য আর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বড়োমানুষদের জীবনে ব্যর্থতা বহুবার আসে। কিন্তু তাঁরা তা কীভাবে কাটিয়ে ওঠেন অনায়াসে, এটিই তাঁদের জীবনপ্রবাহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়। পৃথিবীর যেকোনো বড়োমানুষের মতোই কালামও নিজের জীবন ও কর্মের জগতে সহস্র বাধাকে অতিক্রম করেছিলেন কীভাবে, আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তা খুঁজে নেব। বাধার প্রবল ঝঞ্ঝা তাঁকে খড়কুটোর মতো চিহ্নহীন করে ফেলতে চাইলেও বার বার ফিরে এসেছেন তিনি, রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো ভস্ম থেকে পুনরায় জন্ম নিয়েছেন।

এমআইটি বা ম্যাড্রাস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজিতে পাঠগ্রহণকালে, কালামের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল দুটি অকেজো বিমান। সে-দুটি রাখা ছিল ডেমনস্ট্রেশন বা ছাত্রদের দেখিয়ে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। শৈশবে আকাশের অবাধ নীল শূন্যে পাখিদের উড়াল তাঁকে মুগ্ধ করত, পাখির মতো অবাধে আকাশে উড়বার জন্য মানুষের যে-সংকল্প, সে-ভাবনা তাঁকে বিমোহিত করে রাখত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই প্রথম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর, বিশেষ একটি শাখা যখন বেছে নেওয়ার সময় এল, প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি বেছে নিলেন এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (বিমান চালনা-সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা)। এরই সাহায্যে তিনি ডানা মেলেছিলেন আকাশের মতো তাঁর বিশাল বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে।

এমআইটি-তে শিক্ষাক্রমের কাজ যখন শেষ হল, কালামকে একটি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া

হয়। তিনজন সহপাঠীর সহযোগিতায় তাঁকে বানাতে হবে স্বল্প উচ্চতায় ওড়ার একটি আক্রমণ-বিমানের নকশা। বিমানের বায়ুগতি-সংক্রান্ত নকশাটি প্রস্তুত করা ও অঙ্কনের দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। একদিন ডিজাইন শিক্ষক, অধ্যাপক শ্রীনিবাসন, যিনি ছিলেন এমআইটি-র তৎকালীন ডিরেক্টর, কালামের কাজের অগ্রগতি দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁকে মাত্র তিন দিন সময় দিলেন নকশার ড্রয়িং প্রস্তুত করার জন্য, নতুবা তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। কালামের মতো একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তানের কাছে এই বৃত্তিটিই ছিল সম্বল। মর্মাহত তিনি, নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারারাত জেগে নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে যখন কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন, তখন তাঁর ঘরে এলেন অধ্যাপক শ্রীনিবাসন। কাজ খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে কালামকে জড়িয়ে ধরলেন, পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, 'জানতাম তোমার ওপর খুব চাপ দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি কাজটা করতে বলেছি সেটা অসম্ভব। এত চাপের মধ্যে তুমি এত ভালো কাজ করবে আমি আশা করিনি।'

এমআইটি-র পাঠ শেষ করে কালাম যোগ দিলেন হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)-এ, শিক্ষানবিশ হিসেবে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো তাঁর কাছে ছিল খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ও উত্তেজনায় পূর্ণ। এখানে পিস্টন ও টারবাইন— দুরকম ইঞ্জিনেরই মেরামতির কাজ শিখলেন। পোড়ানোর পর গ্যাসের গতি-সংক্রান্ত বিদ্যা এবং প্রসারণ প্রক্রিয়ার যে কার্যকর নীতিগুলি সম্পর্কে তাঁর ধোঁয়াশা ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে গেল। র‍্যাডিয়াল ইঞ্জিন-কাম-ড্রাম-সংক্রান্ত কাজও তিনি এখানেই শিখেছিলেন।

গ্র্যাজুয়েট এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এইচএএল থেকে বেরোবার পর তাঁর সামনে দুটি চাকরির সুযোগ এল। একটি বিমানবাহিনীর, অপরটি প্রতিরক্ষা দপ্তরে, ডাইরেকটরেট অফ টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন, সংক্ষেপে ডিটিডি অ্যান্ড পি (এয়ার)-এ। দুটিতেই তিনি দরখাস্ত করলেন। প্রায় একই সময়ে দু-জায়গা থেকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক এল। ডিটিডি অ্যান্ড পি (এয়ার)-এর ইন্টারভিউ হয়েছিল দিল্লিতে। বিমান বাহিনী (এয়ার ফোর্স সিলেকশন বোর্ড)-এর ইন্টারভিউ হয়েছিল দেরাদুনে। এখানে আটজন

অফিসারকে নিয়োগ করার জন্য যে-পঁচিশ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কালামের স্থান হল নবম। বিমান বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ শেষ। আকৈশোর আকাশে উড়ালের লালিত আশা যে সমাপ্ত, তা অনুভব করে হতাশায় মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু এই হতাশার বৃত্তে আটকে না থেকে ভবিতব্যকে মেনে নিলেন। দিল্লি ফিরে এসে খোঁজ নিতে গিয়ে পেলেন ডিটিডি অ্যান্ড পি (এয়ার)-এর নিয়োগপত্র। আড়াইশো টাকা বেতনে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু হল।

চাকরিজীবনের শুরুতে প্রথমে তাঁকে পাঠানো হল কানপুরে এয়ারক্রাফট অ্যান্ট আরমাটেট টেস্টিং ইউনিটে। তার কিছুদিন পর পাঠানো হল নবগঠিত প্রতিষ্ঠান এয়ারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এসটাবলিশমেন্টের দপ্তরে, ব্যাঙ্গালোর শহরে।

এডিই-তে যোগদান করার পরের বছর কালামের কাছে একটি প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তাব এল। প্রকল্পটি একটি স্বদেশি হোভারক্রাফটের নকশা ও পরিণত রূপদানের। হোভারক্রাফট এমন এক প্রকার যান, যা স্থল জল কাদা বরফ সবকিছুর ওপর দিয়েই চলতে পারে এবং প্রয়োজনে আকাশেও উড়তে পারে। ভারতীয় পুরাণপ্রসিদ্ধ শিবের বাহনের নাম অনুসারে, হোভারক্রাফটটির নাম দেওয়া হল নন্দী। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেননও এই প্রকল্পটির অগ্রগতিতে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তিনি একে দেখেছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের স্বদেশি উৎপাদনের সূত্রপাত হিসেবে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সকলে এ-বিষয়টি মানতে চাননি। কালামের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁর আড়ালে আবডালে তাঁকে 'গেঁয়ো ভূত' বা 'কুলির সর্দার' বলে ব্যঙ্গ করতেন। তাঁকে মনে করতেন মাত্রাতিরিক্ত আশাবাদী এক পাগল, আকাশে উড়ে বেড়ানোই যাঁর কাজ। যাই হোক, কঠোর পরিশ্রম ও ইস্পাতদৃঢ় সংকল্পের সাহায্যে কালাম হোভারক্রাফটটি নির্মাণ করতে সক্ষম হলেন। নির্মাণশেষে সেই ব্যঙ্গকারী সহকর্মীদের তিনি বলেছিলেন, 'এই যে হোভারক্রাফটটি, এটি কোনো ছিটগ্রস্ত মানুষের বানানো নয়, দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি। এটি শুধু তাকিয়ে দেখবেন না, কারণ, এটি শুধু দেখবার জন্য নির্মাণ করা হয়নি, এতে চেপে উড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।'

কিছুদিন পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন মন্ত্রীত্ব হারালেন ভারত-চীন যুদ্ধে ভারতের ব্যর্থতার দরুন। স্বদেশে নির্মিত হোভারক্রাফটের সামরিক ব্যবহার-সংক্রান্ত তাঁর চিন্তাধারার অনুসারী কেউ ছিল না, তাই প্রকল্পটি বাতিল হল। অর্থাৎ বাতিল হয়ে গেল কালামের জীবনের প্রথম সফল রূপায়িত প্রকল্প।

অবশ্য এর পরে-পরেই কালাম ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেলেন ইন্ডিয়ান কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (আইএনসিওএসপিএআর)-এর কাছ থেকে। আইএনসিওএসপিএআর-এর তখন অধিকর্তা ছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই, তিনি কালামের ইন্টারভিউ বোর্ডেও ছিলেন। সেই দিনের সেই তরুণটির মধ্যেকার ঘুমন্ত প্রতিভাকে অনুভব করতে তাঁর দেরি লাগেনি। দু-দিনের মধ্যেই তাঁকে আইএনসিওএসপিএআর-এর অন্তর্ভুক্ত করা হল রকেট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে।

১৯৬২ সালের শেষার্ধে আইএনসিওএসপিএআর সিদ্ধান্ত নিল একটি বিষুবীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপন করবে থুম্বা নামে কর্মকোলাহলহীন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের গ্রামে। গ্রামটি কেরালার ত্রিবান্দ্রমের কাছে। গ্রামটিকে বেছে নেওয়ার কারণ ছিল, জায়গাটি পৃথিবীর চুম্বকীয় নিরক্ষরেখার খুব কাছে। এভাবেই ভারতে রকেটভিত্তিক গবেষণার সূচনা। থুম্বাতে যে-এলাকাটি অধিগ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে একটি বড়ো গির্জাও ছিল। যদিও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ জমি অধিগ্রহণ করা খুবই স্পর্শকাতর, তবুও তা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হল। ত্রিবান্দ্রমের তৎকালীন বিশপ রাইট রেভারেন্ড ড. ডেরিরা এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। থুম্বা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম কার্যালয় হল সেন্ট মেরি মাগডালেন গির্জা। ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক বৈরিতা নয়, তাদের সহাবস্থানেই হল ভারতবর্ষে মহাকাশবিজ্ঞানচর্চার শুভ সূচনা।

আইএনসিওএসপিএআর-এ যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর কালামকে ছ-মাসের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হল, ন্যাশনাল এরোনটিক অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এ সাউন্ডিং রকেট স্টেশনের একটি শিক্ষাক্রমের জন্য। সাউন্ডিং রকেট এমন এক প্রকার রকেট, যা মূলত ব্যবহার করা হয় পৃথিবীর

নিকটতম পরিবেশে অনুসন্ধানের জন্য। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর পরিবেশেও অনুসন্ধানের জন্য এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে পারে।

আমেরিকা পৌঁছে কালামের কাজ শুরু হল নাসা-র অন্তর্ভুক্ত ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটনে অবস্থিত ল্যাংলে গবেষণা কেন্দ্রে (এলআরসি)। এলআরসি থেকে তিনি গেলেন গোডার্ড মহাকাশ যাত্রা কেন্দ্র (গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার)-এ। প্রশিক্ষণের শেষ হল ভার্জিনিয়ার ইস্ট কোস্টের ওয়ালপথ দ্বীপে। সেখানে রিসেপশন লবিতে রাখা একটি ছবি দেখে তিনি অভিভূত হলেন। ছবিটি একটি যুদ্ধের দৃশ্য, কিন্তু তাতে যেসব সৈনিকরা রকেটগুলি উৎক্ষেপণ করছিলেন, তাঁরা কেউ শ্বেতাঙ্গ নন, অশ্বেতকায়, তাঁদের মুখাবয়ব দক্ষিণ এশিয়ার লোকের মতো। ছবিটি ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধরত টিপু সুলতানের বাহিনীর। ১৭৯৯ সালে তুরুখানাল্লির যুদ্ধে টিপু সুলতান যখন নিহত হন, ব্রিটিশরা হাতে পেয়ে যায় সাতশোর বেশি রকেট এবং ন-শো রকেটের অন্তর্গত বিভিন্ন উপব্যবস্থাদি। টিপু সুলতানের নিজের দেশ তাঁকে বিস্মৃত হলেও নাসা যে যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারকারী এক বীর হিসেবে তাঁকে উচ্চাসনে বসিয়েছে, তা দেখে কালাম মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কালাম নাসা-তে তাঁর প্রশিক্ষণ শেষ করে ফিরে আসার ঠিক পরেই ২১ নভেম্বর ১৯৬৩-তে উৎক্ষিপ্ত হল ভারতের প্রথম সাউন্ডিং রকেট নাইকে-অ্যাপাশে। নাইকে-অ্যাপাশের সফল উৎক্ষেপণের পর ড. সারাভাই কালামকে জানালেন তাঁদের আগামী কর্মসূচির কথা। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ বাহন বা স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (এসএলভি) প্রস্তুতির। লঞ্চ ভেহিক্যাল বা উৎক্ষেপণ-যান হল এক প্রকার বাহক রকেট, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে শূন্যে কোনো পেলোড বা বাহনবস্তুটিকে বহন করে নিয়ে যায়। স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যালের ক্ষেত্রে পেলোডটি হল একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। এসএলভি-র কথা জানানোর সঙ্গে-সঙ্গে ড. সারাভাই কালামকে সামরিক বিমানের রকেট সহায়ক উড়াল ব্যবস্থা রকেট অ্যাসিস্টেড টেক-অফ সিস্টেম বা র‍্যাটো সম্বন্ধে অধ্যয়ন আরম্ভ করতে বললেন। আপাত দৃষ্টিতে এই

দুটি প্রকল্পের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে হলেও কালাম জানতেন, বিক্রম সারাভাই নামের বিরাট মানুষটি নিশ্চয় দূরগামী কোনো ভাবনা ভেবেছেন। অবশেষে দেখা গেল এটিই সত্যি। একদিন দিল্লির উপকণ্ঠে টিলপট রেঞ্জেও একটি রাশিয়ান র‍্যাটো দেখিয়ে সারাভাই কালামকে জিজ্ঞেস করলেন, রাশিয়া থেকে এই সিস্টেমটি আনিয়ে দিলে তিনি আঠারো মাসের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারবেন কি না? কালাম তৎক্ষণাৎ সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন।

বায়ুযানে র‍্যাটো মোটর লাগানো হয় ওড়া শুরুর সময় তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেবার অতিরিক্ত শক্তি জোগানোর জন্য, যাতে প্রতিকূল অবস্থায়, যেমন বোমার আঘাতে আংশিকভাবে বিনষ্ট রানওয়ে থেকে, অধিক উচ্চতায় অবস্থিত বিমানক্ষেত্র থেকে কিংবা নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে বেশি ওজন নিয়ে উড়বার সময়ে কিংবা অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশের মধ্যে উড়বার প্রয়োজনীয় শক্তি তার থাকে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রচুর র‍্যাটো মোটরের প্রয়োজন ছিল এস-২২ ও এইচএফ-২৪ বিমানগুলিকে হিমালয়ের ছোটো ছোটো রানওয়ে থেকে ওড়ানোর জন্য।

১৯৬৯ সালে অধ্যাপক সারাভাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন নিজস্ব উপগ্রহ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের জন্য একটি আদর্শ রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূর্ণনের পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার জন্য অধ্যাপক সারাভাই পূর্ব উপকূলের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নির্বাচন করলেন চেন্নাইয়ের একশো কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত

শ্রীহরিকোটা দ্বীপ। এইভাবে এসএইচএআর রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের জন্ম হল। চন্দ্রকলার আকৃতিবিশিষ্ট দ্বীপটির প্রস্থ প্রশস্ততম স্থানে আট কিলোমিটার। এর ক্ষেত্রফল চেন্নাই শহরের সমান।

ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটে যায়। ১৯৬৮ সালে আইএনসিওএসপিএআর পুনর্গঠিত হল এবং ইসরো (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন) নামে পরিচিত হল।

এসএলভি একটি মাল্টি-স্টেজ রকেট অর্থাৎ এর ছিল একাধিক পর্যায়। মাল্টি-স্টেজ রকেটের কার্যনীতি হল— এর প্রথম পর্যায়টি রকেটকে চালু করবে এবং রকেটকে ঊর্ধ্বগতি দান করবে। উড়ালের একটি পর্যায়ে রকেটটি প্রথম পর্যায়কে নিজের শরীর থেকে ত্যাগ করবে ও আরও অধিক ভরবেগ সংগ্রহ করবে। এভাবে একের পর এক পর্যায় ত্যাগ করে রকেটটি শূন্যে ধাবিত হবে। এসএলভি-থ্রির ছিল চারটি পর্যায়। অধ্যাপক সারাভাই বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে পর্যায়গুলি গঠন করার দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। কালামের ওপর পড়েছিল চতুর্থ পর্যায় গঠনের দায়িত্ব।

১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর র‍্যাটো পদ্ধতির সফল পরীক্ষা হল। একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জেট বিমান বারোশো মিটারের হ্রস্ব দৌড়ের পর ভূমি ত্যাগ করল। সাধারণত যে-দৌড়ের দৈর্ঘ্য ছিল দুই কিলোমিটার। এতদিন ভারত যে-র‍্যাটোগুলি আমদানি করত, তার প্রতিটির জন্য খরচ পড়ত তেত্তিরিশ হাজার টাকা, কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতে তৈরি র‍্যাটোর উৎপাদন-ব্যয় দাঁড়াল সতেরো হাজার টাকা। র‍্যাটো প্রকল্পটি সফল হলেও, পরে এটিও পরিত্যক্ত হয়েছিল, কারণ, যে-বিমানগুলির জন্য এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, সেই বিমানগুলি কালোপযোগিতা হারিয়েছিল। নতুন উদ্ভাবিত বিমানগুলির জন্য র‍্যাটো-সিস্টেম প্রয়োজন ছিল না।

১৯৭৯ সালের ১০ অগাস্ট নির্ধারিত হল এসএলভি-থ্রি-র প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান। পঁচিশ মিটার দীর্ঘ চার পর্যায়ের সতেরো টন ওজনের এসএলভি রকেটটি সকাল ৭টা ৫৮ মিনিটে ভূমি ত্যাগ করল ও তার নির্দিষ্ট পথ ধরে যাত্রা শুরু করল। পর্যায়-১ কাজ করল নিখুঁতভাবে। প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছোল মসৃণভাবে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। হঠাৎ দেখা গেল দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

তিনশো সতেরো সেকেন্ডের পর উড়ানটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হল, শ্রীহরিকোটার পাঁচশো ষাট কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে পাওয়া গেল বাহনটির ধ্বংসাবশেষ, যার মধ্যে পেলোডসহ কালাম-নির্মিত চতুর্থ পর্যায়টিও ছিল।

হোভারক্রাফট নন্দীর অকালমৃত্যু, র‍্যাটোর পরিত্যাগ, এসএলভি-র ব্যর্থ উড়ান— পর পর ধাক্কাগুলি কালামকে গভীরভাবে গ্রাস করেছিল। এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বর্ষীয়ান বিজ্ঞানী ব্রহ্মপ্রকাশ। ড. ব্রহ্মপ্রকাশ কালামের সামনে তুলে ধরলেন ক্ষত নিয়ন্ত্রণের নীতি: 'স্বস্থানে এখনই ফিরে গেলে, ঠিক সেরে উঠবে।'

দ্বিতীয় এসএলভি-থ্রি উৎক্ষেপণের তিরিশ ঘণ্টা আগে ১৭ জুলাই ১৯৮০-র বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানারকম ভবিষদ্‌বাণী দেখা গেল। একটি সংবাদপত্রে বেরোল— 'প্রকল্প অধিকর্তা আবদুল কালাম নিখোঁজ, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।' পরদিন, ১৮ জুলাই ১৯৮০-র সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে এসএলভি-থ্রি শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করল। ছ-শো সেকেন্ড পরে কম্পিউটারে পাওয়া ডেটা থেকে জানা গেল, রোহিণী উপগ্রহ (পেলোড হিসেবে যাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল) যাতে কক্ষপথে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য চতুর্থ পর্যায়ে তাকে প্রয়োজনীয় বেগ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর পর দু-মিনিটের মধ্যে রোহিণী স্বল্প উচ্চতার কক্ষে স্থাপিত হল। এই সময় কালাম তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেছিলেন, 'মিশন ডিরেক্টর সমস্ত স্টেশনকে বলছি, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। মিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পর্যায় নিজের নিজের কাজ করছে। চতুর্থ পর্যায়ে অ্যাপোজি মোটর রোহিণী উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করবার জন্য প্রয়োজনীয় বেগ দান করেছে।' চারিদিকে হর্ষধ্বনি, আনন্দাশ্রু, উৎফুল্ল সহকর্মীদের কাঁধে কালাম— এই খণ্ড দৃশ্যগুলির সঙ্গে রচিত হল এক ইতিহাস, ভারত সেই অতি অল্প সংখ্যক জাতির মধ্যে স্থান পেল, যারা নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ-ক্ষমতার অধিকারী।

এসএলভি-থ্রি সফল উৎক্ষেপণের প্রায় এক মাস পর দিল্লি থেকে অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ানের একটি ফোন পেয়েছিলেন কালাম। কালামকে জানানো হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। কালাম খুবই আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করলেও তাঁর মনে একটি ছোটো সংশয় ছিল, সেটা পোশাক-সংক্রান্ত। তিনি ঘরোয়া ধরনের পোশাক পরেন, পায়ে পরেন স্লিপার, তা কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উপযুক্ত বেশবাস। অধ্যাপক ধাওয়ানকে সেই সমস্যাটির কথা বলতে, তিনি দিলেন সরস জবাব, 'তোমার যে-সাফল্য, সেটিই তোমার সুন্দর পোশাক।'

১৯৮১ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে কালাম একটি খুশির খবর পেলেন। ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা বেলা দিল্লি থেকে টেলিফোন করে খবর দেওয়া হল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ঘোষণা করেছে, তাঁকে পদ্মভূষণ প্রদান করা হবে। অধ্যাপক ব্রহ্মপ্রকাশ সংবাদটি শুনে কালামকে বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে যেন আমার ছেলে পদ্মভূষণ পেল।'

কিন্তু এই পদ্মভূষণ প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র রকমের। অনেকে যেমন আনন্দিত হলেন, অনেকে হলেন ঈর্ষান্বিত, অনেকে মনে করলেন তাঁর প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে।

এত পরিশ্রম, এত আত্মত্যাগের পর এরূপ বৈরিতা। কালাম ভাবলেন, আবার সব নতুন করে শুরু করবেন, একেবারে শূন্য থেকে। শেষ পর্যন্ত ইসরো থেকে তিনি ছুটি নিলেন। কালামের মতো একজন অপরিহার্য বিজ্ঞানীকে ইসরো ছাড়তে চায়নি। কালাম যে-সংস্থায় যোগ দিতে চেয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে কয়েক দফায় ইসরোর উপদেষ্টামণ্ডলীর চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল। যাই হোক, অবশেষে কালামের নাম প্রস্তাবিত হল ডিআরডিএল-এর ডাইরেক্টর হিসেবে। ১৯৮২ সালের ইসরোতে দীর্ঘ আঠারো বছরের কর্মজীবন শেষে কালাম যোগ দিলেন ডিআরডিএল-এ। ডিআরডিএল-এ তখন এক হতাশার অধ্যায়। ভারত সরকার ঘোষিত ডেভিল ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পটি বাতিল হওয়ার জের সংস্থাটি তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কর্মীরা গভীরভাবে নিমজ্জমান। কালামের মনে হল কবি কোলরিজের 'দ্য রাইম অফ এনসিয়েন্ট মেরিনার'-এর কয়েক পঙ্‌ক্তি:

দিনের পর দিন, দিনের পর দিন আমরা
এক জায়গাতেই অনড়, বায়ু নেই, গতি নেই;
ছবিতে আঁকা সমুদ্রে
ছবিতে আঁকা জাহাজের মতো কর্মহীন।

কালাম দেখলেন এ-মনোভঙ্গি দীর্ঘায়িত হলে সমূহ বিপদ। ডিআরডিএল-এর মধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের সমিতি গঠিত হল, যার নাম দেওয়া হল ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি কমিটি (মিসাইল টেকনোলজি কমিটি)। যার লক্ষ্য হল নিজেদের দেশে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট কর্মসূচি গড়া। একটা খসড়া প্রস্তুত করা হল ক্যাবিনেট কমিটি ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স (সিসিপিএ)-তে বিবেচনার জন্য। আনুমানিক খরচের একটি হিসেব ধার্য হল, বারো বছরের সময়সীমার জন্য ধার্য হল তিনশো নব্বই কোটি টাকা।

সাউথ ব্লক (প্রতিরক্ষামন্ত্রক)-এ এ-বক্তব্য উপস্থাপিত হল। উপস্থাপনায় পৌরহিত্য করলেন তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমন এবং তিন সামরিক বাহিনীর প্রধান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী কালামের প্রস্তাব ক্যাবিনেটে পেশ করলেন ও পাশ করিয়ে নিলেন। প্রস্তাবসমূহের সম্পর্কে সুপারিশ গৃহীত হল ও তিনশো আটাশি কোটি টাকা মঞ্জুর হল। শুরু হল স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সবচেয়ে বৃহৎ বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞ, ইনটিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, যাকে সংক্ষেপে বলা হত আইজিএমডিপি।

২৭ জুলাই ১৯৮৩-তে আইজিএমডিপি-র উদ্‌বোধন হল। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের নামকরণ করা হল। ভূমি থেকে ভূমি-অস্ত্রব্যবস্থাটির নাম হল পৃথ্বী। ট্যাকটিক্যাল কোর ভেহিক্যালসটির নাম হল ত্রিশূল। ভূমি থেকে আকাশ— প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটির নামকরণ করা হল আকাশ। এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্রকে বলা হল নাগ। কালামের নিজের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন রেকস ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম তিনি নিজে দিলেন অগ্নি।

সঠিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায় হল নিখুঁত পরিকল্পনা। দলনেতা হিসেবে এটি কালাম যথার্থ অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি ঠিক করেছিলেন প্রতিটি প্রকল্পের কাজ যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই সমর্পণ করার।

কর্নেল ভি জে সুন্দরম ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইএমই কর্পসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিল, যান্ত্রিক কম্পন (মেকানিক্যাল ভাইব্রেশনস) সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে দেওয়া হল পৃথ্বী প্রকল্পে নেতৃত্বের দায়িত্ব। ত্রিশূল প্রকল্পের নেতা নির্বাচন করা হল ভারতীয় নৌবহরের কমান্ডার এস আর মোহনকে। তাঁর ছিল ইলেকট্রনিক্স ও ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান এবং জটিল বিষয়কে জলবৎ তরল করে বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। কালামের স্বপ্নের অগ্নি প্রকল্পের জন্য এমন একজনকে প্রয়োজন ছিল, যিনি প্রকল্প পরিচালনায় তাঁর হস্তক্ষেপ মাঝে মাঝে সহ্য করবেন। এরকম মানুষকেই তিনি খুঁজে পেলেন। আর এন আগরওয়ালের মধ্যে। এমআইটি পাশ এ-মানুষটি ডিআরডিএল-এর (এয়ারোনটিকাল টেস্ট ফেসিলিটিজ) প্রকল্প অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে চালাচ্ছিলেন। আকাশ ও নাগের জন্য নির্বাচন করা হল তরুণ বিজ্ঞানী প্রহ্লাদ ও এন আর নায়ারকে।

দায়িত্ব বণ্টনের এরকম বিন্যাস অনেকেরই পছন্দ হয়নি। পারস্পরিক মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আহূত ডিআরডিএল-এর প্রথম সভাটিতেই কালামকে একজন বয়স্ক বিজ্ঞানী এম এন রাওয়ের কাছ থেকে শুনতে হল একটি অপ্রিয় প্রশ্ন: 'এই পঞ্চপাণ্ডবকে (অর্থাৎ পাঁচজন প্রকল্প পরিচালককে) আপনি কীসের ভিত্তিতে নিয়োগ করলেন?' কালামের সরস উত্তর, 'এই পঞ্চপাণ্ডব সদর্থক চিন্তা নামক দ্রৌপদীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে

আবদ্ধ।' অপর একজন তরুণ বিজ্ঞানীর কঠিন প্রশ্ন: 'প্রোজেক্ট ডেভিলের মতো এই প্রকল্পও কতটুকু চলার পর বন্ধ করে দেবেন?' কালামের দৃঢ় উত্তর, 'এটি শুরু হবে নকশার কাজ দিয়ে ও শেষ হবে ঠিকভাবে প্রয়োগের পর।'

টিম গড়া ও সাংগঠনিক কাজ চালু হওয়ার পর কালাম দেখলেন ডিআরডিএল-এ যে-পরিমাণ জায়গা আছে, তা আইজিএমডিপি-র বিশাল পরিমাণ জায়গার চাহিদা মেটানোর পক্ষে একান্তই অনুপযোগী। তাই উপযুক্ত জমির খোঁজে তিনি গেলেন নিকটবর্তী ইমরত কাঞ্চা অঞ্চলে। বৃক্ষহীন, বড়ো বড়ো পাথরের চাঁইভর্তি এই রুক্ষ শূন্য প্রান্তরে কয়েক দশক আগে ডিআরডিএল উদ্ভাবিত ট্যাঙ্কধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা হত। জায়গাটি নির্বাচিত হল। ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র ও আকাশ থেকে ছবি নেওয়ার জন্য সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হল। পাথরের মধ্যে জলের উৎস সন্ধানের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল কেন্দ্রীয় ভূ-জল পর্ষদকে।

এরপর প্রয়োজন মিসাইল পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। পূর্ব উপকূলের ওড়িশার বালেশ্বরে নির্বাচিত হল সে-স্থান। এই প্রকল্পটি যদিও তখন প্রবল বাধার মুখে পড়েছিল, কারণ, সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের স্থানান্তরণকে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় করে তোলা হয়েছিল।

১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ডিআরডিএল-এর পরিদর্শনে এলেন। উড়ান ব্যবস্থার পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে আইজিএমডিপি-র বহু দিক দেখলেন। সব শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথ্বীর উড়ান ব্যবস্থা কবে শুরু হবে। উত্তরে কালাম বললেন, 'জুন ১৯৮৭।' তিনি অনুরোধ করলেন কর্মসূচিতে যেন আরও গতি আনা হয়। দুর্ভাগ্যবশত প্রধানমন্ত্রী এ-উড়ান দেখে যেতে পারেননি, এর কিছুদিন পর নিজেরই নিরাপত্তারক্ষীর হাতে তিনি নিহত হন।

দু-শো আশি জন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ডিআরডিএল-এর গতিপ্রকৃতি বদলে দিলেন। ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি স্বপ্ন থেকে ক্রমে বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করল। ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমের প্রথম উৎক্ষেপণটি হল ১৬ সেপ্টেম্বর

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীহরিকোটার পরীক্ষাস্থল থেকে ত্রিশূল ভূমি ত্যাগ করল। ডিআরডিএল-এর বিজ্ঞানীদের মধ্যে আশ্বাস এল— 'আমরাও পারি'।

সমগ্র জাতি যেন হয়ে উঠল অগ্নিমন্ত্রে জাগ্রত। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের যুক্ত করল এ-প্রকল্পে। পৃথ্বীর নকশা করা হয়েছিল ইনটারন্যালি গাইডেড মিসাইল হিসেবে। সঠিকভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য তার মধ্যে অবস্থিত একটি কম্পিউটারে দিতে হয় যাত্রাপথের প্যারামিটারস। অধ্যাপক ঘোষালের নেতৃত্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক স্তরের একটি টিম সেরকম একটি অ্যালগোরিদম প্রস্তুত করলেন। ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা অধ্যাপক আই জি শর্মার নেতৃত্বে আকাশের জন্য তৈরি করলেন বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবস্থা, যার সাহায্যে একযোগে একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা যাবে। অগ্নির জন্য রি-এন্ট্রি ভেহিক্যাল সিস্টেম ডিজাইন করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল মাদ্রাজের আইআইটি-র একটি তরুণ গোষ্ঠীর দ্বারা। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাভিগেশনাল ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার প্রস্তুত করল নাগের জন্য একটি অত্যাধুনিক সংকেতনির্ধারক অ্যালগরিদম।

১৯৮৮-এর গোড়ার দিকে পৃথ্বীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তখনও বালেশ্বরের অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা অঞ্চল (ইনটারিম টেস্ট রেঞ্জ) সম্পূর্ণ হতে কম করেও বছর খানেক দেরি। তাই সে-সময় পৃথ্বী উৎক্ষেপণের জন্য শ্রীহরিকোটায় (এসএইচএআর) বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। পৃথ্বী উৎক্ষিপ্ত হল ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ সালের সকাল ১১ টা ২৫ মিনিটে। একটি ভূমি থেকে ভূমি-ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উড়ান হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক চর্চার বিষয়। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ প্রথমে বিস্মিত হল, পরে কুপিত হল। যেসকল প্রতিবেশী দেশ ভারতের সুহৃদ নয়, তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হল।

অগ্নির উৎক্ষেপণের দিন নির্ধারিত হল ১৯৮৯ সালের ২০ এপ্রিল। উৎক্ষেপণের ১৪ সেকেন্ড আগে হঠাৎ কম্পিউটারে বৈদ্যুতিন সংকেত ভেসে উঠল— Hold। অর্থাৎ কোথাও একটি যন্ত্র ভুলভাবে কাজ করছে। সঙ্গে-সঙ্গে শোধরানোর পর দেখা গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরও অনেক ব্যাপারে Hold-এর প্রয়োজন

দেখা দিল। ডিআরডিএল-এর নিরলস কর্মযোগী বিজ্ঞানীরা মুষড়ে পড়লেন, কিন্তু কালাম অবিচল। দুঃখে আঘাতে ভেঙে পড়া টিমকে তিনি জানালেন এসএলভি-থ্রি-র ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার কথা। বললেন, 'আমি আমার উৎক্ষেপণ-যানকে সমুদ্রে হারিয়েছিলাম বটে কিন্তু ফিরেও এসেছিলাম সাফল্যকে সঙ্গে নিয়ে। তোমাদের ক্ষেপণাস্ত্র তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। কয়েক সপ্তাহের পরিশ্রম ছাড়া তোমরা আসলে কিছুই হারাওনি।'

দশ দিন বিশ্লেষণের পর ১ মে ১৯৮৯-এ আবার ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত করা হল। কিন্তু আবার— Hold! আবার উড়ান বাতিল করা হল। স্থগিত রাখতে হল উৎক্ষেপণ। বিদেশেও রকেট-ব্যবস্থায় এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে, কিন্তু ভারতের 'অতি পণ্ডিত' সংবাদমাধ্যম এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে কুরুচির প্রতিযোগিতায় নামল। ব্যঙ্গচিত্রী সুধীর ধর আঁকলেন, এক দোকানি একটি উৎপাদিত দ্রব্য ফেরত দিচ্ছে— একজন বিক্রয়-প্রতিনিধিকে যে বলছে, এর দশা অগ্নির মতো হবে না। 'হিন্দুস্থান টাইমসে' দেখানো হল একজন নেতা গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'আগাম সতর্কবার্তার কোনো প্রয়োজন নেই ... এটা একটা বিশুদ্ধ শান্তিপূর্ণ, অহিংস ক্ষেপণাস্ত্র।' এক ব্যঙ্গচিত্রী দেখালেন, 'অগ্নি হল এক প্রকার আইডিবিএম— ইন্টারমিটেন্টলি ডিলেইড ব্যালিস্টিক মিসাইল'— যার অর্থ, ক্রমাগত স্থগিত রাখা সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র। আমুল মাখনের ব্যঙ্গচিত্রে দেখানো হল— অগ্নির ওড়ার জন্য যা চাই, তা হল আমুল মাখন!

পুনরায় উৎক্ষেপণের জন্য দিন ধার্য হল ১৯৮৯-এর ২২ মে। সকাল ৭ টা ১০ মিনিটে অগ্নি ভূমি ত্যাগ করল। মাত্র ছ-শো সেকেন্ডের একটি সুন্দর উড়ান মুহূর্তে মুছে দিল এত দিনকার সকল গ্লানি। ড. কালাম তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন:

আকাশের পানে চালিত করার এক বস্তু
কিংবা অশুভ শক্তির প্রতিরোধ হিসেবে
অগ্নির দিকে তাকিয়ে দেখো না,
এ হল ভারতীয় হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ।

এভাবেই রচিত হল নতুন ইতিহাস। এক প্রকল্পের বাধাবন্ধ অতিক্রম করে সাফল্যে আরোহণ। বুদ্ধ গান্ধীর দেশে অহিংস নীতিকে অনেকে মনে করত দুর্বলের আত্মপ্রতারণা, তারাও অনুভব করল এক বলীয়ান আত্মগরিমায় সমৃদ্ধ এক জাতির পুনরুজ্জীবন।

একজন মানুষ। কর্মপথে তাঁর অসংখ্য বাধা, প্রতিবন্ধকতা। জীবন কখনোই যাঁর কাছে ছিল না কুসুম বিছানো পথ। বরাবরই চলতে চলতে রক্তাক্ত হয়েছে পদতল, তবুও এগিয়ে চলেছেন আলোকসন্ধানে। অন্বেষণের সাধনাতে নিজেই হয়েছেন আত্মদীপ। সাধক-কবি তিরুভাল্লুভরের এই কবিতাটিই হতে পারে এ পি জে আবদুল কালামকে প্রকাশ করবার সার্থক উপমা: 'যতই গভীর হোক নদী, হ্রদ বা সামান্যতম একটি ডোবার জল, যে-রূপেই থাকুক-না-কেন তাদের বক্ষাধারিত জলরাশি, হোক সে-জল শীতল উষ্ণ বা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ— মৃণাল উৎসারিত হবেই, প্রজ্বলিত হবে তার দলমণ্ডল।'

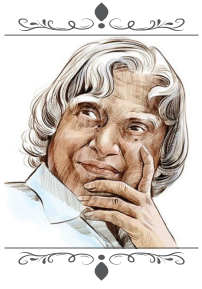

চিরকালীন শিক্ষক

একরামূল হক শেখ

Teaching is a very noble profession that shapes the character, calibre and future of an individual ... youth have a dream and also they have a pain. The pain comes out of their dream; they want to live in a prosperous, happy and peaceful India. This type of students environment ignites me and leads me to interact with young minds.

— Dr A P J Abdul Kalam [The Hindu, 5 September 2013]

তিন জন অস্থায়ী ও তেরো জন স্থায়ী মিলিয়ে এ-পর্যন্ত মোট পনেরো জন ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। উল্লেখ্য, বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি (১৮৯৪—১৯৮০) রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে আড়াই মাসের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পূর্বে এঁদের মুখ্য পেশার পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়, ছ-জন শিক্ষকতা, পাঁচ জন আইন, দু-জন রাজনীতি, একজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অপর জন শিক্ষকতা ও আইনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৮৮৪—১৯৬৩) বিহারের লঙ্গাত সিং কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ হন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (১৮৮৮—১৯৭৫)। ১৯৬৭ সাল থেকে

তাঁরই জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর প্রতিবছর শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেন (১৮৯৭—১৯৬৯) প্রায় আট বছর উপাচার্যের দায়িত্ব সামলেছেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের। সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশের আগে নবম রাষ্ট্রপতি ড. শংকরদয়াল শর্মা (১৯১৮—১৯৯৯) লক্ষ্ণৌ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়িয়েছেন। দেশের দশম রাষ্ট্রপতি ড. কোচেরিল রামণ নারায়ণন (১৯২০—২০০৫) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসে দীর্ঘকাল প্রথমে কূটনীতিবিদ ও পরে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন ১৯৭৯ সালে। দেশের ত্রয়োদশতম রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতি ও দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্ব সামলানোর আগে শিক্ষকই ছিলেন। ১৯৫৭ সালে প্রায় ছ-মাস শিক্ষকতা করেন হাওড়া জেলার আমতার তাজপুর এম এন রায় ইনসটিটিউটে। মূলত বাংলা, ইংরেজিসহ কলাবিদ্যার প্রায় সব বিষয়ই পড়াতেন। পরে ১৯৬৩—১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিদ্যানগর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িয়েছেন ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর প্রণববাবু। উল্লেখ্য, টিচার-ইন-চার্জের পাশাপাশি দু-বছর ওই কলেজের সহকারী অধ্যক্ষও ছিলেন তিনি।

চতুর্থ রাষ্ট্রপতি বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি মাদ্রাজ হাইকোর্ট, পঞ্চম রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহ্‌মেদ (১৯০৫—১৯৭৭) লাহোর হাইকোর্ট এবং অষ্টম রাষ্ট্রপতি রামস্বামী ভেঙ্কটরমণ (১৯১০—২০০৯) মাদ্রাজ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আইনের অনুশীলন করতেন। দ্বাদশতম রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল (জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলা আদালতের আইনজীবী ছিলেন। কর্ণাটকের বাগলকোট জেলায় নিজের জন্মস্থান জমাখণ্ডি আদালতের আইনজীবী বাসাপ্পা দানাপ্পা জাত্তি (১৯১২—২০০২) ছিলেন দেশের তৃতীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

সরাসরি রাজনীতি দিয়েই জনজীবনে প্রবেশ করেন ষষ্ঠ ও সপ্তম রাষ্ট্রপতি যথাক্রমে নীলম সঞ্জীব রেড্ডি (১৯১৩—১৯৯৬) এবং জ্ঞানী জৈল সিং (১৯১৬—১৯৯৪)। দেশের একাদশতম প্রধান বিচারপতি

ও দ্বিতীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ হেদায়াতুল্লাহ্ (১৯০৫—১৯৯২) নাগপুরের ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ল-এ ব্যবহারশাস্ত্র ও মুসলমান আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। পাশাপাশি নাগপুর উচ্চ আদালতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন তিনি। একাদশতম রাষ্ট্রপতি আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম (১৫ অক্টোবর ১৯৩১—২৭ জুলাই ২০১৫) ১৯৫৮ সাল থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশের আগে পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত কাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানান শীর্ষস্থানে থেকে দেশকে, বিশেষ করে মহাকাশবিদ্যায়, সমুন্নত করেছেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে মাত্র কয়েক মাস শিক্ষকতা করলেও, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিদায়ের পরই পুরোপুরি শিক্ষকতার জীবনে প্রবেশ করেন তিনি।

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগুরু, বিদ্যার্থীর আচার্য

দিনটা ১০ জুন ২০০২। চেন্নাইস্থিত আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি ক্লাসে কালাম পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন। দীর্ঘ চার দশক ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বেশ কয়েকটি সংস্থায় এবং শেষ দু-বছর, নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত ভারতের মুখ্য বিজ্ঞান উপদেষ্টার কর্মজীবন শেষে নিজের শিক্ষকতার আবেগ পূরণ করেছেন ডিসেম্বর ২০০১ থেকে। তাঁর ক্লাসে ষাট জন ছাত্রের অনুমোদন থাকলেও, মাঝে মাঝে তা চারশোর কাছাকাছি চলে যেত। লক্ষ্যের স্বপ্ন (ভিশন টু মিশন) ছিল ওই দিনের লেকচারের শিরোনাম। লেকচারের জন্য নির্ধারিত সময় কখন যে এক ঘণ্টা থেকে বেড়ে দু-ঘণ্টা হয়ে গিয়েছিল, তা শিক্ষক কালাম বা ছাত্র-ছাত্রী কেউই নজর করেননি। এবং ওই দিনটিই ছিল শিক্ষক হিসেবে আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে কালামের শেষ দিন। এরপর পাঁচ বছর তিনি ভারতের প্রথম নাগরিক, একাদশতম রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ছাড়া পেয়ে উন্নত ভারত গড়ার অভিপ্রায়ে ছাত্র ও যুবকদের অনুপ্রাণিত করতে মনস্থ করেন তিনি। ২০০৭ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি গোটা ভারতবর্ষ চরকির মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, ছোটো-বড়ো অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে, তাঁর ভিশন ২০২০ ও পিইউআরএ (প্রোভাইডিং

আরবান অ্যামেনিটিজ টু রুরাল এরিয়াজ)-কে সফল করতে। এরই মাঝে শিক্ষকতা করেছেন দেশ-বিদেশের বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। আইআইএম আহ্‌মেদাবাদ, আইআইএম শিলং ও আইআইএম ইন্দোর— এই তিনটি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন তিনি। ব্যাঙ্গালোরস্থিত ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ সায়েন্সের সম্মানিত ফেলো, তিরুবনন্তপুরমের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চান্সেলর এবং আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক তিনি। হায়দরাবাদের ইন্টারন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজিতে তথ্য-প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রযুক্তিবিদ্যা পড়িয়েছেন। ভারতের প্রথম আইআইটি খড়্গপুরে সাম্মানিক অধ্যাপক হিসেবে সামাজিক রূপান্তর ও নেতৃত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লেক্সিংটনস্থিত গ্যাটন কলেজ অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্সে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এবং তাঁর ভাবনার বিস্তার ঘটিয়েছেন বহু শিক্ষায়তন, গবেষণাগার ও ইনসটিটিউটে।

কেবল উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র নয়, কালামের ভাবনায় সর্বদাই জুড়ে থাকত গ্রাম ও গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা।

২০০৬ সালে রাষ্ট্রপতি থাকা কালে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর চিন্তাভাবনায় সে-কথাই ধরা পড়ে। তাঁর মতে, ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল করে তুলতে হলে প্রয়োজন সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার ও পুনর্গঠন। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দল এক সৃজনশীল পাঠক্রম ও ক্লাসরুমের উদ্ভাবন করবেন। এই প্রক্রিয়াকে সফলভাবে কার্যকরী করতে দরকার প্রশিক্ষিত ও সৃজনশীল উদ্যমী শিক্ষক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বিচরণ করলেও তাঁর মস্তিষ্কে অবিরাম ঘুরপাক খেত শিক্ষাধারা ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে নানা অন্বেষণ ও উদ্ভাবন। তাঁর একটি রচনায় তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন:

১. পড়াশোনায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকর্ষ অর্জনের নিয়মিত উৎসাহ দান জরুরি। তাদের মধ্যে অন্বেষণ, সৃজনশীলতা, প্রযুক্তিবোধ, উদ্যমী স্বভাব, নৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এর ফলে পড়ুয়া হয়ে উঠবে স্বনির্দেশিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত চিরকালীন শিক্ষার্থী।

২. গ্রামের প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য গ্রহণ করতে হবে উন্নত ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা। একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, বিশেষত গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি ও তথ্য-প্রযুক্তির উপকরণ, সমস্ত কিছুই থাকা দরকার।

৩. দেশকে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে গেলে শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই লক্ষ্য পূরণে আমাদের পঁয়তিরিশ কোটি নিরক্ষর ভারতবাসীকে স্বাক্ষর ও আরও অনেককেই চাকরিযোগ্য দক্ষতা অর্জনের নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৪. গ্রামীণ এলাকায় এবং শহুরে প্রান্তিক ও দরিদ্রদের মাঝে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করাতে হবে। এজন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন।

৫. শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি সময়ের দাবি। বর্তমানে এই খাতে জিডিপি-র মাত্র ৪ শতাংশ ব্যয় করা হয়। দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে এই ৪ শতাংশকে কমপক্ষে ৬-৭ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।

৬. একটা হিসেবে পাওয়া যায়, পঞ্চম শ্রেণির পর ৩৯ শতাংশ ও অষ্টম শ্রেণির পর ৫৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী মাঝপথে পড়া বন্ধ করে দেয়। এই ড্রপ আউট রোধ না করতে পারলে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

৭. প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর শিক্ষাক্রম চালু করা আবশ্যিক। এতে সময় ও স্থান সংকুলান সমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়। জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনের জন্য ডিজিটাল গ্রন্থাগার ও ভার্চুয়াল ক্লাসরুম চালু হলে এর সুফল সুদূরপ্রসারী হয়। একসঙ্গে দেশের বহু শিক্ষাকেন্দ্র থেকে এই সম্পদগুলো টেলি-এডুকেশন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিষয়টা নিয়ে সম্যক উপলব্ধি ও গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে সুউচ্চ শিখরে অবস্থানকারী কালামের পা মাটিতে না থাকলে, এই ধরনের আলোচনা কোনোমতেই সম্ভব হত না। ২০০৩ সালে শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি বলেন, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একজন পড়ুয়া স্কুল ক্যাম্পাসে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘণ্টা সময় কাটায়। স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিবেশ তার জীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। সুতরাং স্কুলে থাকা প্রয়োজন সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক, যাঁদের পড়ানো ও পড়ানোর প্রতি ভালো লাগা এবং নৈতিক গুণাবলি সৃষ্টির ঐকান্তিক আগ্রহ থাকবে। শিক্ষকগণকে পড়ুয়াদের আদর্শ হতে হবে। একইসঙ্গে, সর্বোত্তম গুণাবলিসম্পন্ন নিজেকে গড়তে পড়ুয়াদেরও সবসময় সজাগ থাকতে হবে। ভবিষ্যৎ-জীবনের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রজ্বলিত হতে হবে। (আউটলুক, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩)।

তাঁর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছুই ছিল না, অকাতরে নিজেকে বিলিয়েছেন। তরুণ সম্প্রদায়কে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করতে ভিশন ২০২০ নিয়ে নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর ভাবনা। তাঁর মতে, তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে গবেষণা, অনুসন্ধান, সৃজনশীলতা ও নৈতিক নেতৃত্বের সক্ষমতা গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সংস্কার প্রয়োজন। প্রযুক্তি ইন্ডিয়া ২০২০ মিশনে তাহলে তাদের পূর্ণ ভাগীদারি থাকবে। এজন্য উৎসাহিত করতে হবে এক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক

গবেষণাকে। এইসব গবেষকদের দেশের মধ্যেই নিয়োগের সুযোগসুবিধা থাকা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আমাদের মানবসম্পদ সংস্থা গড়া জরুরি। এর দ্বারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণায় নিয়োজিত তরুণ সমাজ উপকৃত হবে। পশ্চিমি উন্নত দেশের সমকক্ষ হবে এই তরুণ সমাজ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতীয় যুব সমাজের ৩০ শতাংশ ক্রমবর্ধনশীলভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে, যা এখন প্রায় ১০ শতাংশ। এবং বাকি ৭০ শতাংশ শিল্প কৃষি ও সেবামূলক ক্ষেত্রে উন্নত দক্ষতাসম্পন্ন হবে।

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হয়েও কলাবিদ্যার প্রতি ব্যতিক্রমীভাবে তিনি ছিলেন অনুরক্ত। বেশ কয়েকটি আলোচনা-গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি নিয়মিত কবিতাও লিখতেন। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে ২০০৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানেও কলাবিদ্যার পড়াশোনা থাকা চাই। আমি এটাও চাই— অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সৃজনশীলতার উচ্চ প্রাথমিকতা। আমার প্রস্তাব, স্কুলে প্রতিদিন বিকেল বেলা পড়ুয়াদের কারিগরি ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। এইসব পড়ুয়ারা মাধ্যমিক উত্তীর্ণের সার্টিফিকেটের সঙ্গে সঙ্গে, তারা কী কী কাজে সক্ষম, সেটা সংবলিত আরও একটি সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের কর্মনিযুক্তির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে।

খুবই গভীর ও কার্যকরীভাবে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে অন্বেষণ না করলে, এ-ধরনের দীর্ঘমেয়াদি বাস্তববাদী কার্যকর পরিকল্পনার উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। কালাম তাঁর সমগ্র জীবনে একেবারে কচি পড়ুয়া থেকে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যাজ্ঞ হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মিশেছেন, পড়িয়েছেন, আলাপ-আলোচনার দ্বারা করেছেন উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, একবাক্যে তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন, কালাম একজন মহান অনুপ্রেরণাদাতা, আদর্শ শিক্ষাগুরু।

কলকাতার ছাত্র-ছাত্রী ও কালাম

শিয়ালদহ লরেটো স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা সিস্টার সিরিল কালামের স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, কলকাতার

রাজভবনে একটি নৃত্যনাটক 'আগামীর ভারত, স্বপ্নের ভারত' দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই নাটকটিতে গৃহহীন শিশু, যারা লরেটো রেনবো হাউসে থেকে পড়াশোনা চালাচ্ছে, তারা অভিনয় করেছিল। সিস্টার বলেন, তিনি খুবই খোশমেজাজে ওইসব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি সিস্টারকে বলেন, এরাই প্রকৃত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে।

অন্য একটি ঘটনাও খুবই উল্লেখ্য। সাহা ইনসটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের স্বর্ণ-জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। ওই প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন ডিরেক্টর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. বিকাশ সিংহ তাঁকে তাঁর পুরোনো প্রতিষ্ঠান স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে নিয়ে যান। সেখানকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি এমনভাবে মিশে গেলেন, যেন তিনি তাদের বহুদিন ধরেই চেনেন। পড়ুয়ারাও সদাহাস্যপরায়ণ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপে মশগুল হয়ে ওঠে।

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেশার ও তাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত গড়ার অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করতে তিনি ছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে সফল। ফলে তাঁর প্রয়াণে সমাজের সর্বস্তরের

নাগরিকদের সঙ্গে তরুণ প্রজন্ম ও ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের এক প্রিয় মানুষকে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাধারার প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশ ও বিদেশের বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নানান কর্মসূচি ও প্রকল্প ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের সমস্ত স্কুলে 'আদর্শ নাগরিক' কালামের জীবনী পাঠ্য হবে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার কিষাণগঞ্জ এগ্রিকালচার কলেজের নাম কালামের নামে রাখলেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দশ লাখ পর্যন্ত শিক্ষাঋণ প্রকল্পের নাম প্রয়াত রাষ্ট্রপতির নামে রাখার কথা ঘোষণা করেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির নাম এ পি জে আবদুল কালাম টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি হবে বলে ঘোষণা করেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রীও ওই রাজ্যের একটি প্রতিষ্ঠানের নাম কালামের নামে রেখে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী শিক্ষানুরাগী সত্যম রায়চৌধুরি সম্পাদিত শিক্ষার্থীদের উপযোগী 'পিউপিলস প্রেসিডেন্ট এ পি জে আবদুল কালাম' ও 'কালাম-কথা' বইদুটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন যথাক্রমে সৌরভ গাঙ্গুলি ও নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু।

কালামের স্কুলের শিক্ষার্থীরা কীভাবে তাদের বিখ্যাত প্রাক্তনীকে স্মরণ করল? রামনাথপুরমের সোয়ার্জ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটির প্রতিষ্ঠা ১৭৮৫ সালে। তামিল মাধ্যমের এই শিক্ষালয়ে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পড়েছেন কালাম। কালামের প্রয়াণ উপলক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানে কোনো ছুটি ছিল না, যথারীতি ক্লাস হয়েছে। কালামকে স্মরণ করতে প্রতিষ্ঠানের বাইরে একটি চেয়ারে বাঁধানো ছবি রাখা ছিল। উল্লেখ্য, কালাম আগেভাগেই বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে ছুটি না দিয়ে সবাই যেন বেশি বেশি করে কাজে লিপ্ত থাকে। আর ওই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিক্রিয়া? সোয়ার্জ স্কুলে কালামের প্রিয় বিষয় গণিত পড়ান ছাব্বিশ বছরের এক শিক্ষিকা, নাম শাকিলা। তিনি জানেন, কালামের কবর দেওয়া উপলক্ষ্যে তাঁর পৈতৃক নিবাস রামেশ্বরমে অসংখ্য মানুষের ভিড় হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে উপস্থিত হন। এনডিটিভি-র সাংবাদিকের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি

বলেন, 'I feel proud to teach in the same school. The children were so upset when he died. But he will live forever in the hearts of children.'। তাঁর নিজ স্কুল ও ভারতের সমস্ত শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের হৃদয়েই থাকবেন কালাম।

শেখা ও শেখানোর অক্লান্ত স্বপ্নদ্রষ্টা

স্বদেশ কিংবা বিদেশ, শহর হোক বা গ্রাম, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর নির্দিষ্ট কর্মসূচির বাইরে, হয় কোনোকিছু শিখিয়েছেন, নয়তো নিজে শিখেছেন। যুগপৎ তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। রাষ্ট্রপতি হিসেবে সুইজারল্যান্ড সফরে যান ২০০৫ সালে। জুরিখের সুইস ফেডারাল ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি পরিদর্শন করেন। জার্মানি থেকে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন জুরিখে এসে এখানেই প্রথম পড়াশোনা করেছিলেন। এই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশে অভিভাষণে ভারতীয় বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রমণের উদ্‌বুদ্ধকারী এক উপদেশ তিনি শোনান: 'আমাদের জয়ের উদ্দীপনা চাই, এমন চালিকাশক্তি চাই, যা আমাদের এই পৃথিবীতে সঠিক জায়গায় বহন করে নিয়ে যাবে। এমন চৈতন্য চাই, যা আমাদের গর্বিত সভ্যতার উত্তরসূরি হিসেবে এই গ্রহে সঠিক স্থান লাভ করতে সাহায্য করবে। যদি এই অপরাজেয় চৈতন্য জাগ্রত হয় তাহলে কোনোকিছুই আমাদের সঠিক ভবিতব্য অর্জনে প্রতিরোধ করতে পারবে না।'

গ্রিসে পৌঁছে তিনি প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন বৌদ্ধিক নিদর্শন দেখতে আগ্রহী হন। পৌঁছে যান দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে সক্রেটিস গুহায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের একজন সক্রেটিস, কেন তিনি বিষ পান করে নিজের জীবন শেষ করেন। মহামনীষী সক্রেটিস বলতেন, তাঁর সদুপদেশের মূল্য তাঁর জীবনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যুক্তিবোধের পরম্পরায় কালাম উত্তর খুঁজে পেয়ে আশ্বস্ত হন।

এভাবে তিনি শিখেছেন অনেক, শিখিয়েছেন তার চেয়েও ঢের বেশি। কেবলমাত্র বইপত্র শিক্ষক অধ্যাপক লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ ছিল না তাঁর জ্ঞান-আহরণ। দৈনন্দিন জীবনের

ছোটো-বড়ো অতি তুচ্ছ ঘটনাতেও তিনি তাঁর ও সমাজের শিক্ষণীয় ভাবনাটি গ্রহণ করতে পারতেন, এখানেই তিনি অনন্য। আমরা তাঁর আত্মজীবনী থেকে এরকম কয়েকটি চিত্র তুলে ধরতে পারি:

১. কালাম তখন ইন্ডিয়ান কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (ইনকসপার)-এ রকেট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। আমেরিকার ন্যাশনাল এরোনটিক অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এ ছ-মাসের একটি শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যে তাঁকে ১৯৬২ সালে পাঠানো হয়। তিনি লক্ষ করেন, নাসার রিসেপশন লবির দেয়ালে টাঙানো এক ছবিতে যুদ্ধক্ষেত্র ও পেছনে কয়েকটি রকেট উড়ছে। কৌতূহলবশত ছবিটির খুব কাছে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর লড়াইয়ের ছবি এটি। নাসায় একজন বীর হিসেবে উচ্চাসনে এক ভারতীয়কে দেখে অপর এক ভারতীয় কালাম গর্ব অনুভব করেন। তাঁর মতে, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রকেট নির্মাণকে দেখা যেতে পারে টিপু সুলতানের স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন হিসেবে। উল্লেখ্য, ১৭৯৯ সালে তুরুখানাল্লির যুদ্ধে টিপু সুলতান নিহত হলে ব্রিটিশরা সাতশোর বেশি রকেট ও ন-শো রকেটের উপকরণ পেয়ে যায়। টিপুর সৈন্যবাহিনীতে ছিল সাতাশটি ব্রিগেড, যাদের বলা হত কুশুন এবং প্রত্যেক ব্রিগেডের ছিল এক কোম্পানি রকেট-সৈনিক, যার নাম ছিল জোরক। এই রকেটগুলিকে ব্রিটিশ রকেট-প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তক উইলিয়াম কংগ্রিভ (১৭৭২—১৮২৮) ইংল্যান্ডে নিয়ে যান। সেই রকেট থেকে পিছনের দিকে হেঁটে, তার নির্মাণকৌশল আবিষ্কার করেন তাঁরা। তখনকার দিনে পেটেন্ট-ব্যবস্থা না থাকায়, টিপুর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে, দেড়শো বছরের জন্য ভারতীয় রকেটবিদ্যার অবসান ঘটে।

২. ছাত্রজীবন শেষে কর্মজীবনে ঢোকার জন্য কালামের কাছে একইসঙ্গে দুটো চাকরির সুযোগ আসে। তার মধ্যে একটি ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, বিমানচালক হওয়া। দেরাদুনে এয়ারফোর্স সিলেকশন বোর্ডে ইন্টারভিউ দিয়ে পঁচিশ জনের মধ্যে তাঁর স্থান হয় নবম। কিন্তু অফিসার নেওয়া হবে আট জন। স্বাভাবিকভাবে তিনি খুবই বিষণ্ণ, হতাশ। কোনোক্রমে হেঁটে পৌঁছোলেন হৃষীকেশ। গঙ্গায় স্নান করে পৌঁছান স্বামী শিবানন্দজির আশ্রম। স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্নভঙ্গের কথা,

হতাশার কথা বলেন। প্রত্যুত্তরে স্বামীজি জানান, 'তোমার যা নিয়তি তাকে স্বীকার করে নাও, তারপর তোমার জীবনে তুমি এগিয়ে যাও। বিমান-বাহিনীর পাইলট হওয়া তোমার নিয়তি নয়। ভবিষ্যতে তুমি কী হবে এখনও তা প্রকাশ পায়নি, কিন্তু তা পূর্বনির্ধারিত। আজকের ব্যর্থতা ভুলে যাও, কেননা, তোমাকে তোমার নিয়তি-নির্ধারিত পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ অত্যাবশ্যক ছিল। তার বদলে তোমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান করো। বৎস, নিজের সঙ্গে একাত্ম হও, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করো।' কালাম এসব শুনে অন্য ইন্টারভিউ ডিটিডি অ্যান্ড পি (এয়ার)-এর ফলাফল জানতে নতুন দিল্লি গিয়ে, হাতে হাতে পেয়ে যান নিয়োগপত্র। এবং মনে মনে বলেন, এই যদি হয় আমার অদৃষ্ট তবে তাই হোক। তাঁর মন প্রশান্ত হল এবং বিমান-বাহিনীতে প্রবেশ না করতে পারার ক্ষোভ দূরীভূত হল। জীবনের এই শিক্ষা কালাম সারাজীবনই বয়ে বেড়িয়েছেন। এটি ১৯৫৮ সালের ঘটনা।

৩. ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাস। কালামের নব্বই বছর বয়সি বৃদ্ধ দাদা, তাঁর মেয়ে নাজিমা ও নাতি গুলাম কে মউনুদ্দিন, তিনজন মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন। মউনুদ্দিনের কাছে হজের কয়েকটি ছোটো ছোটো ঘটনা, সুবিধা অসুবিধার কথা কালাম শুনেছেন। মক্কার মূল মসজিদের ওপরের তলে নামাজ পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড়ে আটকে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম মউনুদ্দিনের। হঠাৎ এই পরিস্থিতি থেকে তাঁকে উদ্ধার করে শক্তপোক্ত চেহারার জনৈক আফ্রিকান তীর্থযাত্রী। কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ না দিয়ে, ওই তীর্থযাত্রী ভিড়ের মধ্যে মিশে যান।

অন্য একটি ঘটনায় তাঁর দাদা আরাফাতের ময়দানে প্রার্থনার পর মিনায় ফিরছিলেন। পনেরো কিমি রাস্তা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে তাঁরা ফিরছেন। কিন্তু হঠাৎই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি বিকল হলে মরুভূমির তীব্র গরমে তাঁরা দম নিয়ে নিয়ে ফিরছিলেন। এভাবে টানা আট ঘণ্টা গাড়িতে থাকার পর গাড়ির চালক শেষ আধ ঘণ্টার রাস্তাটুকু পায়ে হেঁটে চলার প্রস্তাব দিলে, তা সবাই মেনে নেন। মউনুদ্দিন তাঁর দাদার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে রাস্তায়

একটি ফাটলের কাছে এসে তাঁরা থমকে দাঁড়ান। এবার দাদাকে হুইল চেয়ার থেকে নেমে হেঁটে পার হতে হবে। দু-জন তীর্থযাত্রী সমস্যাটি বুঝতে পেরে তাঁর দাদাকে হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় ফাটলের ওপারে পার করে দিয়ে নিমেষেই ভিড়ে মিশে যান। এবারও কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ থাকল না তাঁদের।

মাঝদালিফার এক জায়গায় শৌচাগারে সকালে বিশাল লাইন। একজন মহিলা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে। পরে এক অল্পবয়সি মেয়ে ওই মহিলার কাছে প্রথমে ঢোকার প্রার্থনা মঞ্জুর করে শৌচাগারে প্রবেশ করেন। একটু পরে আরও একজন বৃদ্ধা এক ঘণ্টারও বেশিক্ষণ দাঁড়ানো মহিলার কাছে একই প্রস্তাব দিলে, লাইনে দাঁড়ানো সবাই ভাবছিলেন, এবার হয়তো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো ওই মহিলা দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবেন না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দ্বিতীয়বারও ওই বৃদ্ধাকে শৌচাগারে প্রবেশের অনুমতি দেন তিনি।

কালামের মতে, এইসব ঘটনা আমাদের শেখায়, ছোটো ছোটো ব্যঞ্জনাপূর্ণ ঘটনা আমাদের জীবনকে

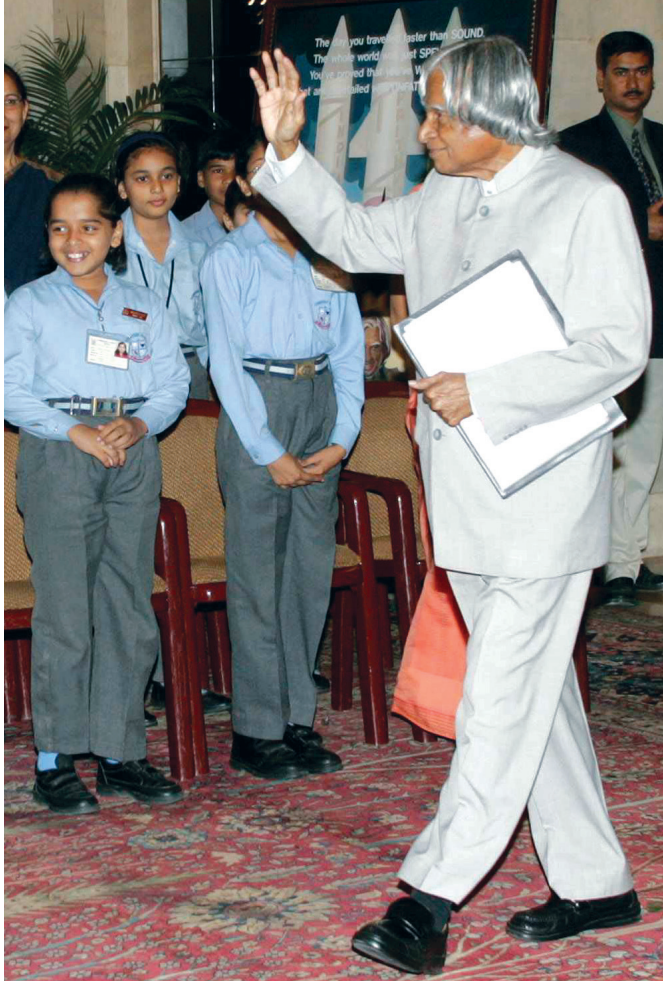

মহৎ করে তোলে। এরকম অসংখ্য শিক্ষণীয় কাহিনির উল্লেখ, কালাম তাঁর লেখায়, কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনায় প্রতিনিয়ত উল্লেখ করতেন। সমালোচনাহীন, বিদ্বেষশূন্য পরশ্রীকাতরতাহীন মানবজীবনের গঠনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ফলে ভারতের হাজার হাজার অনুন্নত গ্রামের সার্বিক বিকাশ নিয়ে তিনি বহু লেখালেখি করেছেন। শহুরে সুযোগ-সুবিধা গ্রামে সরবরাহের যে-পরিকল্পনা তিনি তাঁর ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছেন, তার সুফলও বহু ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে।

তাঁর সমগ্র জীবনই শিক্ষণীয়। তিনি হামেশাই বলতেন, 'কিছু ঘটনা আমার দিগন্তকে আলোকিত করেছিল। আমার মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, আমায় শিক্ষাদান করেছিল, এবং দেশের মানুষের ভালোবাসা আমায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল।' দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ছিল কালামের। লোক দেখানো ব্যাপারস্যাপার একেবারে অপছন্দ ছিল তাঁর। মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে সেবা ও ত্যাগের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব, তা তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন: 'মোমবাতি হওয়ার ভান কোরো না, আলোক দ্বারা আকৃষ্ট মথ হও। সেবার মধ্যে যে-শক্তি লুকিয়ে আছে, তা জানো। দেখা যায় রাজনীতির বহিরঙ্গের সঙ্গে আমরা জুড়ে যাই এবং তাকে রাষ্ট্র গড়ে ওঠা বলে ভুল করি। আত্মত্যাগ, পরিশ্রম ও সাহসিকতা যে কদাচিৎ দেখা যায় বা দেখি, দেশ প্রকৃত অর্থে তা দিয়ে গড়ে ওঠে।'

কালাম দেশের উন্নয়নে ছাত্র ও যুবকদের অংশগ্রহণের পক্ষে বরাবরই সওয়াল করতেন। কারণ, তাঁর বহু সত্তার মাঝে শিক্ষকসত্তা বরাবরই সক্রিয় ছিল। কালামের সঙ্গে প্রায় দু-দশক কাজ করেছেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. জি মাধবন নায়ার। কালামের প্রয়াণে তিনি লিখেছেন, কালামের

দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য-পূরণে যুব সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন জরুরি। সে-কারণে তিনি সবসময় তরুণ সম্প্রদায় ও ছাত্রদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করতেন। এটা একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা যে, কাকতালীয়ভাবে তিনি শিলঙে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বক্তৃতারত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের গত ছ-বছরের ছায়াসঙ্গী সৃজন পাল সিং ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় সহকারী। শিলঙের যাত্রাপথেও তিনি ছিলেন শেষ মুহূর্তগুলির অন্যতম প্রধান সাক্ষী। তাঁর একটি লেখায় কালামের বহু পরিচিতির মাঝে শ্রেষ্ঠ পরিচিতির পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। স্মৃতিচারণায় তিনি বলছেন, 'প্রায়ই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, "তোমার বয়স কম। বলো তো, কীসের জন্য লোকে তোমাকে মনে রাখুক বলে চাইবে?" আমি জুতসই জবাব খুঁজে বেড়াতাম। শেষে একদিন পালটা প্রশ্ন করলাম, "আগে আপনি বলুন, আপনি কী হিসেবে মানুষের স্মৃতিতে থেকে যেতে চান? রাষ্ট্রপতি, বিজ্ঞানী, লেখক, মিসাইল-ম্যান, ইন্ডিয়া ২০২০, টার্গেট ৩ বিলিয়ন ... কোনটা?" ভেবেছিলাম, বিকল্পগুলি দেওয়ায় উত্তরটা সহজ হবে। কিন্তু অবাক করে দিয়েছিল ওঁর জবাব— "শিক্ষক"।'

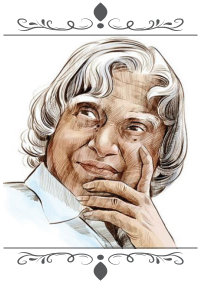

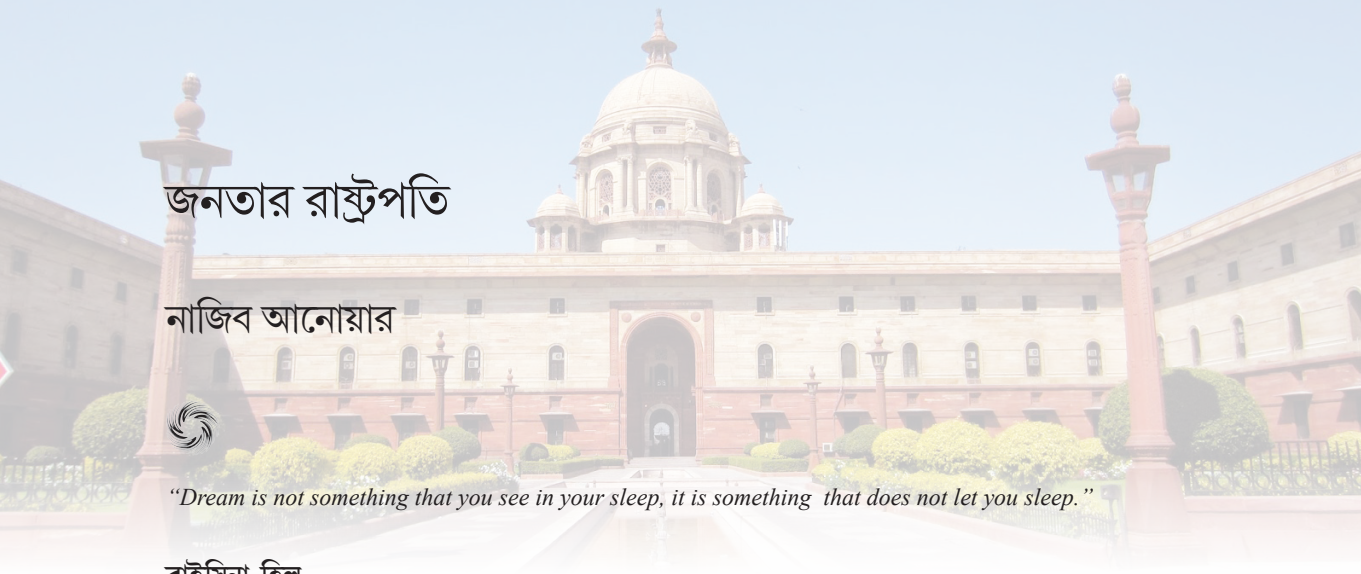

জনতার রাষ্ট্রপতি

নাজিব আনোয়ার

"Dream is not something that you see in your sleep, it is something that does not let you sleep."

রাইসিনা হিল

১৯১১-তে কলকাতা থেকে দিল্লিতে যখন রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, রাইসিনা হিলকে ঘিরেই প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার কথা চিন্তাভাবনা করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। এটির বাস্তবে রূপদানে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়। এই রাইসিনা হিলেই নির্মিত হয় ভাইসরয়ের বিশালাকার প্রাসাদ। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হলে এই প্রাসাদেই ঠাঁই হয় ভারতের রাষ্ট্রপতির। ভাইসরয়ের প্রাসাদ হয়ে যায় রাষ্ট্রপতি ভবন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এ পি জে

সাল ২০০২। রাষ্ট্রপতি ভবনে পা দিলেন এ পি জে আবদুল কালাম। যেকোনো মাপকাঠিতেই তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়া ছিল বেমানান। প্রবীণ রাজনীতিবিদ কিংবা রাধাকৃষ্ণন জাকির হোসেনের মতন পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত টেকনোক্র্যাট— প্রকৌশলবিদ। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে তাঁর

অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু কালামের আগমন রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের তাৎপর্য বহন করে আনল। এই প্রকৌশলবিদ রাষ্ট্রপতির সংজ্ঞা যেন পালটে দিলেন। টাটকা বাতাস বইয়ে দিয়ে নিছক এক নিয়মতান্ত্রিক পদকে পরিণত করলেন আমজনতার আইকনে। রাষ্ট্রপতি কালামকে দুটি বিষয় পৃথক করেছে অন্যান্য রাষ্ট্রপতির থেকে। প্রথমত, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট প্রোটোকল ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, যেকোনো কাজকে জাতীয় মিশনে পরিণত করা ছিল তাঁর অদম্য ইচ্ছা। এটি কালামের কাছে ছিল প্যাশনের নামান্তর। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বললেন, 'বাজপেয়ীজি, রাষ্ট্রপতি হওয়াটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মিশন।' সত্যিই। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোতে তিনি একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে যুক্ত ছিলেন। দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি হওয়াটাও এক গুরুত্বপূর্ণ মিশন ছিল। কালাম নিজেই জানাচ্ছেন তাঁর আত্মজীবনী 'টার্নিং পয়েন্টস: এ জার্নি থ্রু চ্যালেঞ্জেস' বইতে।

প্রোটোকল-উদাসীন

প্রোটোকল মানে রীতি। এখানে কূটনৈতিক রীতি। আগেই বলেছি, এই রীতি ভেঙে দিতে কালাম ছিলেন সদা তৎপর। রীতিকে আক্রমণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে সরকারি খানাপিনার আসরে অতিথিদের বন্ধগলা সুট পরে আসার চিরাচরিত প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মনে হতে পারে এটা এক ধরনের বাড়াবাড়ি। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন রাষ্ট্রপতি হয়ে উঠুন আমজনতার রাষ্ট্রপতি। সেই বোধ থেকেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে তিনি নিরাপত্তার বেড়াজাল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়তেন জনতার ভিড়ে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কালাম বন্ধগলা পরতে অরাজি ছিলেন। আসলে কেতাদুরস্ত হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবগত চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেত না।

সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে ভূতপূর্ব সাংসদ কৃষ্ণা বসু একটি মজার ঘটনা লিখেছেন। তখন আবদুল কালাম

সদ্য রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। তাঁর নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে সাংসদদের বুফে লাঞ্চ। সামান্য আলাপচারিতা, ফলের রস পানের পর খাবার ঘরে খেতে যাবার ডাক। শ্রীমতী বসু খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। খেয়াল করলেন, কেউ যেন একজন প্লেট তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। তিনিও অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়ালেন প্লেটের দিকে। চোখ তুলে তাকাতেই হতবাক। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁর দিকে প্লেট বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে। প্রোটোকল-উদাসীন এমন রাষ্ট্রপতি আগে দেখা যায়নি।

মানুষের প্রতি অপার ভালোবাসা

কালামের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি ছিল নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষ। আমজনতার প্রতি উজাড় করা ভালোবাসা ছিল দেখার মতন। বিশেষত শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর টান। এগুলি লক্ষ করে সম্ভবত এক সাংবাদিক তাঁকে 'আম-আদমির রাষ্ট্রপতি' বলে অভিহিত করেন। কালামের সৌজন্যে রাইসিনা হিলের শীর্ষে অবস্থিত লুটয়েন (Lutyen) সাহেবের পরিকল্পিত বিশাল প্রাসাদের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য। রাজধানীর অভিজাত বৃত্তকে পাশ কাটিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমজনতাকে জায়গা করে দিয়েছিলেন। এক বছর তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর-এক বছর গ্রামীণ সরপঞ্চদের। কোনো এক বছর আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন দেশের বিভিন্ন ডাকঘরের কর্মচারীরা। রাষ্ট্রপতি ভবনের চত্বরে মোঘল উদ্যান প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের সঙ্গে মিশে কথা বলতে দেখা যেত কালামকে। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াতেন। রাষ্ট্রপতি হবার আগে, রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন, রাষ্ট্রপতিপদ থেকে সরে যাবার পরেও— এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিছক ফিতে কাটা রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে না থেকে, তিনি চেষ্টা করতেন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে, ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

মহান দেশপ্রেমিক

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গে অমত হওয়া যেতেই পারে। দেশের পরমাণু নীতি নিয়ে তাঁর মতামত অনেকের নাপসন্দ। দু-দল বিশিষ্ট রাষ্ট্রপতি ধাঁচের গণতন্ত্রের পক্ষে কালামের সওয়াল বিপুল সমালোচিত। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁর নিখাদ ভালোবাসা নিয়ে কারুর কণামাত্র সন্দেহ নেই।

আবদুল কালাম যখন রাষ্ট্রপতি হলেন তখন গুজরাত জ্বলছে। সালটা ২০০২। তিনি প্রথমেই ওই রাজ্যের দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখতে চাইলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে, এই বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী জানতে চাইলেন। কালাম জবাব দিলেন, 'আমি মনে করি এটা আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মানুষের ব্যথা-যন্ত্রণা লাঘবে একটু কাজে আসা ... মনের জোড় লাগাতে

কিছু করা ... '। তাঁর গুজরাত সফর ইতিবাচক হয়েছিল। গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। কালামের দেশপ্রেম নিয়ে বহু কাহিনি আছে। আমি একটি ঘটনার কথা বলে এই নিবন্ধের ইতি টানব। গ্রামের নাম শিচেওয়াল, পঞ্জাবের কাপুরথালা জেলায়। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কালীবেন নদী। শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই নদীর আলাদা তাৎপর্য। এই নদীর তীরেই গুরু নানক আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাদের বিশ্বাস। কয়েক-শো বছর পেরিয়ে গেছে। নদী ক্রমশ বুজে এসেছে, নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। শিচেওয়াল গ্রামের মানুষ এই নদীকে বাঁচাতে তৎপর। কালাম তখন রাষ্ট্রপতি। খবর পেয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন ওই গ্রামে। দিনটি ২০০৬ সালের ১৭ অগাস্ট। গ্রামবাসীদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই কাজে তৎকালীন পঞ্জাব সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রপতি গ্রামবাসীদের উৎসাহ দিতে এটাও বললেন যে, অর্থের চেয়েও উদ্যম অনেক জরুরি। তাঁর এই উদ্যোগ সত্ত্বেও সরকারি টালবাহানা অব্যাহত থাকল। ততদিনে তিনি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে গেছেন। তিনি আবার ওই গ্রাম সফরে গেলেন। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে। স্থানীয়দের বললেন, নদী সংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতে। কালামের মতে, এই নদী সংস্কার একটি মডেলের কাজ করছে। গ্রামবাসীদের এই উৎসাহ উদ্যোগ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমাজের প্রতি দেশের প্রতি

সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসাকে তিনি কুর্নিশ করেছেন। দেশে বিদেশে বহু সভা অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। শিচেওয়াল গ্রামের মানুষ তাঁর কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজও স্মরণ করেন। কালীবেন নদীতে এখন পরিষ্কার জল বইছে।

সালাম কালাম

আবদুল কালামের আগে দশজন রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর পরে হয়েছেন আরও দুজন। বহু রাষ্ট্রপতি তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন। কিন্তু কালাম নানান দিক থেকে অনন্য। তিনি বোধ হয় প্রথম এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি রাষ্ট্রপতি ও আমজনতার মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে ছিলেন সদা তৎপর। তিনি প্রথম দেখিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি কোনো গজদন্ত মিনারে বসবাস করেন না। তাঁরা এই মাটিরই মানুষ। নিঃসন্দেহে তাঁর এই অবদান ভারতের মানুষ মনে রাখবে। তাঁকে সালাম জানাবে। কালামের এই মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রবল স্পৃহা পরবর্তী রাষ্ট্রপতিকেও বোধ হয় প্রভাবিত করেছে। প্রণব মুখোপাধ্যায় এবার শিক্ষক দিবসে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিয়েছেন।

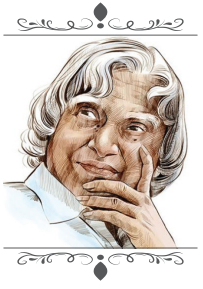

স্বপ্নের কয়েক মিনিট

তাহেরা খাতুন

ছোটো নয়, আমাদের অনেক বড়ো স্বপ্ন দেখতে হবে: এই কথাটি যাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে মনে পড়ল, তিনি বিজ্ঞানী, শিক্ষক, দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন এ পি জে আবদুল কালাম। ছোটো স্বপ্ন দেখা যে কাজের কথা নয়, তা তাঁর জীবনাদর্শের দিকে তাকিয়ে, তাঁর কাজের পরিধির বিশালতা দেখে আজ সত্যিই অনুভব করছি। তিনি নেই। ২৭ জুলাই ২০১৫ তারিখে এই হৃদয়বান মানুষটির হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। যদিও তিনি সমাজ তথা দেশকে যা দিয়েছেন, তা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্টর থেকে অনেক বেশি। তাঁর এই চলে যাওয়াটা একশো কুড়ি কোটি ভারতবাসীর চোখে জল এনে দেয়, হৃদয় কাতর করে তোলে। হয়তো-বা সকলের মতোই, তবু একান্ত আমার কাছে বিশেষ একটি স্মৃতি মনের বেদনাকে আরও ঘনীভূত করেছে। কিন্তু কী করে ব্যক্ত করব তা, কিছু অনুভূতি থাকে, যা মনে হয় ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় না, শুধু অদ্ভুত এক হাহাকারের জন্ম দেয় অন্তরে। এত বড়ো একজন মানুষ, পৃথিবীময় ব্যাপ্ত তাঁর প্রতিভার আলো— তাঁর জন্যে নগণ্য আমার এই আর্ত-অনুভূতির প্রকাশ হয়তো-বা বাড়াবাড়ি! তবু এটা সত্যি, অন্তর ডুকরে উঠেছে, যেরকম প্রিয়জনের মৃত্যুতে হয়।

আজ এই ভেবে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হচ্ছে, এই মহৎপ্রাণ মানুষটির সান্নিধ্য পেয়েছিলাম আমি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তবু আমার জীবনে তা মহার্ঘ হয়ে থাকবে চিরকাল। তখন আমি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাঙ্ক করে সবে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি। পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্সে স্কলারশিপের আবেদন করি। দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্সের সোমনাথবাবু ফোন করে জানান, 'ক্যালকাটা ক্লাব শতবার্ষিকী স্কলারশিপের শুভ সূচনা, রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের হাত দিয়ে উদ্‌বোধন এবং প্রথম স্কলারশিপ প্রদান হবে। তাতে আমার নাম নির্বাচিত হয়েছে।' রাষ্ট্রপতি কালাম স্কলারশিপ প্রদান করবেন এবং আমি তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তা গ্রহণ করব। খবরটা শুনে কতরকম ভাবনা আর বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছি, তা বলে বোঝাবার নয়। সে-দিনটা ছিল ২০০৭-এর ১৪ মে। সন্ধ্যা বেলা ক্যালকাটা ক্লাবের সেমিনার হলে ক্যালকাটা ক্লাব শতবার্ষিকী স্কলারশিপের উদ্‌বোধন। স্কলারশিপের অর্থ নিশ্চয় আমার প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও সে-দিনের অনুষ্ঠান কিন্তু আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে এ পি জে আবদুল কালামের জন্য। তাঁর হাত থেকে স্কলারশিপ গ্রহণ করতে পারার আনন্দ আর উত্তেজনা আমাকে আজও বিহ্বল করে। নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে পৌঁছোলাম। অজ গাঁয়ের মেয়ে আমি, ক্যালকাটা ক্লাবের তৎকালীন সভাপতি দীপক মুখার্জি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, রাষ্ট্রপতির সামনে

কেমনভাবে দাঁড়াতে হবে, কী বলতে হবে, আরও কিছু আদবকায়দা। আমার তো একটা ভয়ের ধুকপুকানি মনের মধ্যে ছিলই, তা খানিকটা কাটল মিস্টভাষী ড. মুখার্জির সঙ্গে কথা হওয়ার পর। ঘড়িতে ঠিক বিকেল পাঁচটা পনেরো। হঠাৎ হলের ভেতরে কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বেড়ে গেল। বুঝতে পারি উনি আসছেন। বুকের মধ্যে আবার যেন হাতুড়ি পেটা শুরু হল। আশ্চর্য আন্দোলনে বুক-ঢিপঢিপ করছে। একবার মনে হল, উনি আসার আগেই মা-বাবাকে নিয়ে পালাই। আরও কত কী যে ভাবছি! নানান এলোমেলো ভাবনার ভিড়ে যখন ডুবে আছি তখন দেখি, উনি এলেন, সঙ্গে রাজ্যের সেই সময়কার রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। তিনি, অর্থাৎ যাঁকে কেন্দ্র করে এত আলোড়ন মনের মধ্যে, সেই স্বপ্নের মানুষটি এখন সামনে উপস্থিত। চোখে মিটিমিটি হাসি। করমর্দন করছেন সবার সঙ্গে। ধৈর্য ধরে শুনছেন সবার পরিচয়। আস্তে আস্তে মঞ্চের দিকে এগোচ্ছেন। তিনি ভারতবর্ষের এক নম্বর ব্যক্তি। হলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সবাই দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে স্বাগত জানালেন। উপস্থিত সবার চোখেমুখে মানুষটির জন্য শ্রদ্ধার ঝলক। তিনি মঞ্চে উঠে স্পষ্ট উচ্চারণে জাতীয় সংগীত গাইলেন এবং সবাইকে ইশারা করে গাইতেও বললেন। ওস্তাদ রাশিদ খাঁর পরিবেশিত উচ্চাঙ্গ সংগীতে মশগুল হয়ে মাথা নাড়লেন। আলতো আঙুলে টেবিলে তাল ঠুকলেন। এসব দেখে মনের আবেগ তখন অন্য মাত্রা পেয়েছে। হায় হায়! রাষ্ট্রপতি এমনও হয় না কি! গানে তাল মেলাচ্ছেন, দর্শক-আসন থেকে কেউ কেউ হাত নাড়লে তিনিও হাত নাড়ছেন। আবার জোর-গলায় জনগণমন গাইলেন। একটু একটু করে এতক্ষণে আমার ভয়ডর আকাশকুসুম কল্পনা কাঁপুনি সব থিতিয়ে গেছে। তবে এতে আমার কোনো বাহাদুরি নেই। তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমাই মূল কারণ। এমন নরম আর প্রশ্রয়ভরা, যে-কেউ তাঁকে সহজেই কাছের মানুষ ভাবতে পারে। রাষ্ট্রপতি আর মিসাইল-ম্যানের অনেক অনেক ঊর্ধ্বের এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর উজ্জ্বল হাত প্রসারিত হয়ে সবাইকে বুকে জড়াতে চায়। ক্যালকাটা ক্লাবের সভাপতির ভাষণের পরে রাষ্ট্রপতি সকলের উদ্দেশে কিছু কথা বললেন। তারপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আমার নাম ঘোষিত হল। মঞ্চে উঠলাম। দীপকবাবুর শেখানো সবকিছু উলটেপালটে গেছে এতক্ষণে। বিশাল এই দেশের

এক নম্বর মানুষটি আর আমি একশো কুড়ি কোটি ভারতীয় জনগণের একজন— মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। বিশাল বটবৃক্ষের তলায় তৃণসম। আমায় উনার বই দিলেন— 'অগ্নিপক্ষ'। শংসাপত্র দিলেন। হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বাবা এসেছেন কি না? তারপর নিজে বাবাকে ডেকে নিলেন। এরপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন, মাকে এনেছি কি না? 'হ্যাঁ' শুনেই, মাকেও মঞ্চে আনালেন। বাবা মঞ্চে উঠে আস্তে করে সালাম দিলেন। উনি সজোরে 'ওয়াআলাইকুম আস্‌সালাম' বলে সালামের উত্তর দিলেন। আমার পড়াশোনা নিয়েও অনেক কথা বললেন। মাথায় হাত রাখালেন আমার। যাঁর মাথায় এত বড়ো দেশের দায়িত্ব, তাঁর হাত আমার মাথায়। সেই হাতে প্রবাহিত হচ্ছে আশীর্বাদ স্নেহ মমতা মায়া, আবার ভবিষ্যৎ-নির্দেশও। মাথায় হাত রেখেই বলেছিলেন, 'বি ডিটারমাইন্ড টুওয়ার্ডস ড্রিম, থিঙ্ক ফর পিপল, স্টে উইথ নিডি।'

সে-দিন থেকেই আকাঙ্ক্ষা করে চলেছি স্বপ্নের সুবিশাল আকাশকে। আর জীবনে কোনোদিন যদি সত্যিই স্বপ্নের বাস্তবকে ছুঁতে পারি, তবেই সার্থক হবে তাঁর প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা আর অশ্রুমোচন।

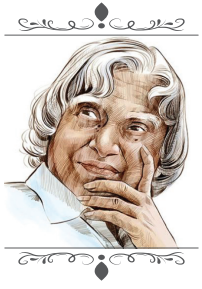

চিরন্তন অনুপ্রেরণা

একরামূল হক শেখ

ছোটোবেলায় আমাদের পড়াশোনায় ছড়া পড়ার এক ধরনের আলাদা মজা ছিল। বাড়ি ও স্কুলে আমরা জোরে জোরে ছড়া আবৃত্তি করতাম। আজকাল বাচ্চাদের ছড়া পড়ার সেই প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। শৈশবের সেইসব ছড়ার বেশিরভাগই আজ বিস্মৃত। তারই মাঝে শিশুসাহিত্যিক ও কবি সুনির্মল বসুর (১৯০২—১৯৫৭) 'সবার আমি ছাত্র' একটু আলাদা। 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র/ নানানভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র' আজও আমাদের স্মৃতিতে অম্লান। বিশেষ করে এই ছত্র ক-টিতে জ্ঞানার্জনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্বরূপ যথার্থরূপে চিত্রিত। শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাগ্রহীতা উভয়ই বিশ্বশিক্ষক মহানবি মহম্মদ (স.)-এরও খুবই প্রিয় ছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর এক চিরস্মরণীয় বাণী— 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতীত কেউ আমার আপন নয়।'

বছর তিনেক আগে শিক্ষা বিষয়ক এক আলোচনাসভায় বিশিষ্ট শিক্ষক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. সৌভিক ভট্টাচার্যের ভাবনাচিন্তা শুনে মুগ্ধ হই। তিনি যাদবপুর, সিনসিনাটি ও টেক্সাসের এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝের পনেরো মাস বাদ দিলে, ১৯৯১ সাল থেকেই

তিনি দেশের প্রথম আইআইটি খড়্গপুরে শিক্ষকতা ও গবেষণায় মগ্ন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাপবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্প্রতি রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার পিলানি শহরস্থিত বিড়লা ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সে উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। ওই সভায় তাঁর অভিমত ছিল, দেশের জাতীয় নেতাদের মধ্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতি

সর্বাধিক শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মতে স্বাধীন দেশে শিক্ষার পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও প্রসারে মৌলানা আজাদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এবং দেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণাও তাঁরই দূরদর্শিতার ফল।

একজন মৌলানা, যাঁর পড়াশোনার প্রায় পুরোটাই স্বগৃহে গৃহশিক্ষকের কাছে, শুধু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মক্তব-মাদ্রাসা-বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষাও প্রায় ছিল না তাঁর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-জগতের একজন বিশিষ্ট শিক্ষকের তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আমাদের অনেককেই বিস্মিত করে। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষাবিস্তারে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের অবদান সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিতে পারি। মৌলানা মুহিউদ্দিন আহমেদ আবুল কালাম আজাদ (১১ নভেম্বর ১৮৮৮—২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮) ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু দীর্ঘ এগারো বছর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও বাস্তববাদী। গ্রামীণ দরিদ্র, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষায় তিনি প্রথম থেকেই গুরুত্ব আরোপ করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে বয়স্ক সাক্ষরতা, বিনা ব্যয়ে চোদ্দো বছর পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকাদের পঠনপাঠন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়েদের শিক্ষা, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বহুমুখী করার ওপর জোর দেন তিনি। তাঁর ভাবনায় ছিল প্রতিটি দেশবাসীর সার্বিক শিক্ষা। ১৯৪৮ সালের ১৬ জানুয়ারি সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা, 'আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবে না যে, অন্তত বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক ভারতবাসীর এক জন্মসিদ্ধ অধিকার। এটি ছাড়া নাগরিক হিসেবে সে তার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।'

দেশে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ও দেশীয় শিক্ষার হালহকিকত ও বর্তমান প্রয়োজন জানতে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন তিনি। ১৯৪৭ সালেই বিজ্ঞানী শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের (১৮৯৪—১৯৫৫) সভাপতিত্বে সায়েন্টিফিক ম্যানপাওয়ার কমিটি তিনি গঠন করেন । এই কমিটির উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দেশে কত মানুষের

প্রয়োজন, তার অনুমান এবং তদনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। ফলস্বরূপ আজ আমাদের দেশ শুধু এ-ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরই নয়, ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মকুশলতার কারণে ভুবনময় সমাদৃতও। এ-বিষয়ে তাঁর অপর এক অক্ষয় কীর্তি উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র আইআইটি স্থাপন। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর), ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)-এর ব্যাপ্তিসাধন এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। শুধুই শিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষা নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংগীতের উচ্চস্তরীয় প্রোতসাহনের উদ্দেশ্যে জাতীয় স্তরে সাহিত্য অকাদেমি, ললিতকলা অকাদেমি ও সংগীত-নাটক অকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (এনবিটি) প্রভৃতি তাঁর বহুজ্ঞতার সন্ধান দেয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া উপলক্ষ্যে ১৯৫১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানে তিনি কবিগুরুর জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শনের ভূয়সী

প্রশংসা করেন। এর আগে ওই বছরেরই ১৮ অগাস্ট আমাদের রাজ্যের খড়্গপুরে দেশের প্রথম আইআইটি উদ্‌বোধন করেন স্বাধীন দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ। এই প্রতিষ্ঠানেই প্রায় সিকি শতক অধ্যাপনারত অধ্যাপক ভট্টাচার্য। আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চস্তরীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণা পরিকাঠামোর পরিকল্পনা ও তার দেশব্যাপী সফল রূপায়ণের কারণেই শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল অধ্যাপক ভট্টাচার্য। দেশগঠন পর্বে ভারতরত্ন মৌলানা আজাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসংস্কারের ফলেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা যে সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এটি অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তৃতার দিনটি ছিল ১১ নভেম্বর অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা দিবস। ভারত সরকার ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর মৌলানা আজাদের জন্মদিন ১১ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষা সংক্রান্ত বিপ্লবে কালাম নামের আরও এক রূপকার আছেন, তবে তিনি আবুল কালাম নন, আবদুল কালাম। ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম (১৫ অক্টোবর ১৯৩১—২৭ জুলাই ২০১৫)। শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের কার্যক্রম ও কৃতিত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য দুটি হল, সমগ্র ভারতবাসীর বুনিয়াদি শিক্ষা, শিক্ষায়তন ও শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে নিরন্তর চিন্তাভাবনা এবং জন্মভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ। এতদ্‌ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কালামের ছিল সৃষ্টিশীল ও বহু বিচিত্র শখ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাজগতের উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিত্ব হয়েও তিনি নিয়মিত কাব্যচর্চা করতেন। 'দ্য লাইফ ট্রি: পোয়েমস' নামে তাঁর একটি কবিতার সংকলনও আছে। ওই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত বাংলা অনুবাদে 'দৃষ্টি' নামক কবিতাতেও জ্ঞান আহরণ ও দেশবাসীর উন্নতির আকুল প্রার্থনা লক্ষণীয়:

আমার নিরন্তর আরোহণ
কোথায় গেল শিখর, হে প্রভু?

আমার অন্তহীন খনন,
কোথায় গেল জ্ঞান, প্রভু আমার?
আমার অবিরাম ভেসে চলা,
বিধাতা আমার, কোথায় আছে শান্তিদ্বীপ?
সর্বশক্তিমান, আমার জাতিকে দাও
অন্তর্দৃষ্টি আর শ্রমজাত আনন্দ অনাবিল।

তাঁর আরও একটি অভিনব কাজ ছিল, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রধানত ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীর নানান প্রশ্নের আহ্বান এবং যথাসময়ে তার জবাব দেওয়া। নার্সারি থেকে প্রাইমারি, সরকারি অসরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ, আইআইটি, আইআইএম-সহ দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের স্রোত ছিল বিরামহীন। জিজ্ঞাসাগুলির অধিকাংশই কৌতূহলোদ্দীপক ও বিষয়ানুগ হলেও বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও আসত। এইসব অনুসন্ধান ছিল তরুণ সমাজের উদ্‌বেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন। অজস্র প্রশ্নের উত্তরে শক্তিধর, সংঘবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী ভারত গঠনই হল কালামের একমাত্র দিকনির্দেশনা। কালামের গবেষণালব্ধ ও সুচিন্তিত এইসব অভিপ্রায় দ্বারা কেবলই শিক্ষাক্রম ও জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশবাসী নয়, আমাদের বিশ্বাস, দেশের প্রত্যেক নাগরিকই অনুপ্রাণিত হবেন। ছয়টি বিভাগে বিন্যস্ত এই প্রশ্নোত্তর পর পর সংকলিত হল:

ভারতীয় স্পিরিট

যদি ৫৪ কোটি তরুণ এই তেজস্বিতায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে, আমি এটা করতে পারি, আমরা এটা করতে পারি এবং ভারতবর্ষ এটা করতে পারে, তাহলে কোনো কিছুই আমাদের জন্মভূমির উন্নত দেশ হওয়ার পথ রুদ্ধ করতে পারবে না।

● সৈনিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী বা রাজনীতিবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশসেবক কাকে বলব?

■ সবাই সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে দেশের সেবায় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। একজন সৈন্য দেশের রক্ষায় নিযুক্ত থাকে এবং দিবারাত্র সজাগ থাকে, যাতে করে একশো কোটির বেশি দেশবাসী নিরুপদ্রবে দেশের উন্নয়নে কর্মঠ থাকতে পারে। একজন শিক্ষক আলোকিত নাগরিক ও ভবিষ্যতের দেশব্রতী সৃষ্টিতে থাকে নিয়োজিত। নিজের মগজাস্ত্রকে ব্যবহার করে মনুষ্যজাতির পীড়া অপসারণ— এটাই একজন চিকিৎসকের জীবনের মূল আদর্শ হওয়া উচিত। বিজ্ঞানীদের উচিত দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের নিয়মিত জোগান দেওয়া।

জাতীয় উন্নয়নের সর্বজনীন লক্ষ্যে সমস্ত বর্গের সব সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকর্মের একীভূত পথ নির্দেশ করাই দেশব্রতী রাজনীতিবিদের কাজ। সর্বোপরি সবাইকে ভালো মানুষ হতে হবে।

● একদিকে ধনী ও গরিবের অসাম্য, অন্য দিকে এগিয়ে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতার কারণে পিছিয়ে যাওয়ার ভয়। এরই মাঝে কার্যকরী পথ কী?

■ শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমাজে চাকরিপ্রার্থীর পরিবর্তে কর্মসংস্থান উদ্ভাবনকারীর উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। বৃহদায়তন গ্রামীণ অকৃষি উদ্যোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা উচিত আমাদের। এর মাধ্যমে গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এভাবেই এক কার্যকরী সমতা সৃষ্টির পথ সুগম হবে।

● একশো কোটিরও বেশি ভারতবাসীর অগ্রনেতা আপনি। আপনার অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিস্বার্থের আগে দেশের স্বার্থকে জায়গা দেওয়াই একমাত্র উপায় নয় কি?

■ এটি এক সুন্দর প্রশ্ন। নেতৃত্বের গুণগত মানই নিজ ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে অনুপ্রাণিত করে। একজন জননায়ক, যিনি কর্মে নিজেকে বিলীন করেন এবং ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নেন ও সাফল্যের কৃতিত্ব নিজ অধীনস্থ গোষ্ঠীকে দেন, তাঁর পক্ষেই জনগণকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব।

● ভারতের জ্ঞানের পাওয়ার হাউস হওয়ার এবং দেশ ও বিশ্বকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পদ্ধতি?

■ শিল্পনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞান-অর্থনীতিতে ভারতকে অগ্রসর হতে হবে। সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে জনগণের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাদের মৌলিক চাহিদাও পূরণ করতে হবে। শিক্ষাপ্রণালী হবে সৃজনক্ষম (ক্রিয়েটিভ), মিথষ্ক্রিয় (ইন্টারঅ্যাকটিভ), স্বশিখন (সেল্ফ লার্নিং) ও বিধি-বহির্ভূত (ইনফরম্যাল)। শুধুমাত্র পাঠ্য বইনির্ভর শিক্ষাদানের বদলে এর কেন্দ্রবিন্দু হবে মান, যোগ্যতা ও উৎকর্ষ। কর্মীরা নিছক দক্ষ বা কিছুটা দক্ষ হিসেবে বিভাজিত না হয়ে হবে টগবগে, নিপুণ, বুদ্ধিমান ও স্বক্ষমতায়নসম্পন্ন। কাজের ধরন সুসংগঠিত ও হার্ডওয়্যার-চালিত হওয়ার পরিবর্তে কম সংগঠিত ও সফটওয়্যার-চালিত হবে। পরিচালকবর্গ হবে অধিক প্রতিনিধিমূলক, কেবলই আদেশ-নিষেধমূলক নয়। বায়ুমণ্ডল ও বিভিন্ন শক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়ভাবে কম হবে।

● এখন থেকে একশো বছর পরের ভারত কেমন হবে?

■ আমার মতে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা এটি নির্ধারিত হবে। প্রথমত, ওই সময় ভারতের থাকবে এক সুদক্ষ ও বিশাল শিক্ষা ব্যবস্থা, ঠিক যেভাবে এক হাজারেরও বেশি বছর আগে বিহারের নালন্দায় ছিল। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরীয় গবেষণার সম্ভাবনা বিদেশিদের ভারতে আসতে আকৃষ্ট করবে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তি ফুরিয়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর কক্ষপথে বসানো বড়ো উপগ্রহ মাইক্রোওয়েভ সৌরবিদ্যুতের জোগান দেবে। তৃতীয়ত, মানবসমাজ মঙ্গল গ্রহে বসতি গড়ে তুলবে। হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে বসবাসও করবে!

● তাজমহল, ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ ও অগ্নি-৩ মিসাইলের মধ্যে ভারতের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?

■ তাজমহল শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ আর্থিক বৃদ্ধির সহায়ক। ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য অগ্নি-৩ দরকার। তুমি একটার জন্য অন্যকে পরিহার বা পরিবর্তন করতে পারবে না।

● বিশ্বে ভারতের সম্মানের সম্ভাবনা?

■ যতদিন না ভারত বিশ্বের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ততদিন কেউ আমাদের সম্মান করবে না। এই জগতে ভয়ের কোনো স্থান নেই। কেবল শক্তিই সম্মান পায়।

শিক্ষার স্পিরিট

সামাজিক ক্ষেত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ দেশকে বদলে দিতে সক্ষম। পিতা, মাতা ও শিক্ষক।

● শিক্ষার অর্থ বই পড়া না বিদ্যালয়ে যাওয়া না জ্ঞান আহরণ?

■ শিক্ষার লক্ষ্য আলোকিত সমাজ সৃজন। আলোকিত সমাজের তিন উপাদান— প্রথম, মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষালাভ। দ্বিতীয়, ধর্মের আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তর। এবং তৃতীয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বিদ্যালয় গমন যুবসম্প্রদায়কে জ্ঞাননির্ভর সমাজের অংশ হয়ে ক্ষমতায়ন করবে। এর দ্বারা নিজ উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় অগ্রগতিতেও তার অবদান থাকবে।

● ভালো শিক্ষার্থীর জন্য সময়ের পরিমাপ?

■ একজন ভালো শিক্ষার্থীর সৃষ্টি তখনই ঘটে, যখন সে তার শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় দুটো বিষয়ের যথোপযুক্ত যত্ন নেয়: জ্ঞান অর্জন এবং সৎ মূল্যবোধ অর্জন।

● পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়ার মতো নানান বিষয় চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এসবকে পরাস্ত করে দায়িত্বশীল পড়ুয়া হওয়ার পথ কী?

■ বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়া জীবনেরই অনুষঙ্গ। একজন দায়িত্ববান পড়ুয়া হিসেবে তোমাকে তোমার শক্তি ও আগ্রহ চিহ্নিত করতে হবে। লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কাজের মাঝে নিশ্চিতরূপেই বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এই প্রতিকূল সমস্যা দ্বারা তুমি কোনোমতেই হারবে না। তোমার উচিত হবে পরাজিত মানসিকতাকে ঘায়েল করে, তোমার লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠতা অর্জন। এভাবেই তুমি জীবনে জয়ী হতে পারবে।

● একদিকে দেশের লক্ষ সার্বিক সাক্ষরতার, অন্য দিকে দিনে দিনে শিক্ষা ব্যয়বহুল হচ্ছে। উভয়ের মধ্যেকার যৌক্তিক ভারসাম্যের উপায় কী?

■ দেশে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার খরচ মোটামুটি কম। এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি খুবই জরুরি। মান বৃদ্ধির জন্য কয়েক জন যোগ্য শিক্ষক পরিচালিত সাম্প্রতিক কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ করতে হবে। টেলি-শিক্ষার মাধ্যমে এর প্রসার ঘটবে। এটি একটি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ, যার ব্যয় সরকারি কোষাগার থেকে হওয়া উচিত। এ ছাড়া উচ্চশ্রেণির পড়ুয়ারা বিনা পয়সায় নীচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পড়াবে।

● একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার ও জীবনযুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় কোনগুলি?

■ শিক্ষায়তনে একজন শিক্ষার্থীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবকাশ থাকা জরুরি। যেমন— ক্রীড়ানৈপুণ্য, তর্ক-বিতর্ক, উদ্যোগী হওয়ার অনুশীলন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিকাশ প্রভৃতি। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এইসব কার্যাবলির অবশ্যই সন্নিবেশ হওয়া প্রয়োজন।

● প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বাস্তব জীবনের সম্পর্ক?

■ প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কার্যকরী সম্পর্ক থাকা উচিত। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের পাশাপাশি চলতে গেলে শিক্ষা ব্যবস্থারও ক্রমোন্নয়ন দরকার। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা ও অনুসন্ধান, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগী নেতৃত্ব, নৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উপযোগী করে গড়া সম্ভব। জীবনযাত্রার বাস্তবতা মোকাবিলায় ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব সূক্ষ্মতা অর্জন জরুরি।

● বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী কেবলমাত্র রুটি-রুজির মাধ্যম না ভবিষ্যতের ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের উদ্ভবের পথ?

■ একজন ব্যক্তির পাঁচ রকম মনের বিকাশ ঘটাতে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, যথা— ডিসিপ্লিনারি বা নিয়মানুবর্তী মন, সিন্থেসাইসিং বা সমন্বয়ী মন, ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল মন, রেসপেক্টফুল বা সম্ভ্রমসূচক মন ও এথিক্যাল বা নৈতিক মন। প্রথম তিনটি চিত্তের সম্পর্ক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং শেষ দুটির সম্পর্ক কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের সঙ্গে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। নৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টিতে উভয় রকমের সমন্বয়পূর্ণ মিশ্রণ দরকার। অন্য কথায়, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, শিক্ষার্থীর পাঁচ ধরনের মন সৃষ্টির। এর ফলে আমরা ভবিষ্যতের ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব পেতে পারি।

● প্রাথমিক শিক্ষা ও সৃজনশীলতার সম্পর্ক?

■ সৃজনশীলতাই ভবিষ্যতের সাফল্য আনে। আর প্রাথমিক শিক্ষাই সেই ক্ষেত্র, যেখানে শিক্ষকরা শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা রোপণ করতে পারেন।

● আদর্শ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য?

■ আমার দৃষ্টিতে একজন আদর্শ ছাত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল— সে ন্যায়নিষ্ঠ হবে। সে এই নীতি অনুসরণ করবে যে, হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার দিনগুলি যাতে নিরর্থকভাবে শেষ না হয়ে যায়। সে পড়াশোনায় উৎকর্ষ অর্জন করবে। সে তার পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হবে। তার লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সে নিজ কার্যকলাপে হবে ধৈর্যশীল। সে পিতামাতা, গুরুজন ও শিক্ষকদের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল।

● কর্মসংস্থান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আজকাল চলছে বেপরোয়া প্রতিযোগিতা। তবুও সাফল্যের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক কৌশলের গুরুত্ব কতটা?

■ পাঁচ থেকে সতেরো বছর বয়সিদের শিক্ষার সময় ছেলে-মেয়ের চরিত্র গঠনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাল। এর বুনিয়াদ গড়বে পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণ। ত্রিচির সেন্ট জোশেফ কলেজে আমার ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করি। আমাদের নীতিবিদ্যা (মর‍্যাল সায়েন্স)-র ক্লাস নিতেন জেসুইট যাজকতন্ত্রের অনুক্রমে সর্বোচ্চ স্থানে থাকা রেভারেন্ড ফাদার রেক্টর। মহান আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অগ্রদূত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি মহত্তম মানুষ নিয়ে প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা ধরে তিনি আমাদের পড়াতেন। আমি নিশ্চিত ওই নীতিবিদ্যার ক্লাসে যা শিখেছি, আজও তার ওপর দাঁড়িয়ে আমি। বিদ্যালয় ও কলেজে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ওই কোর্সের শিক্ষাদান করা হত। এই শিক্ষা তরুণ মানসের উন্নতিসাধন হিসেবে পরিচিত। হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের মহাপুরুষের আলোচনা তরুণ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ধনাত্মক প্রভাব ফেলত। এ ছাড়াও কনফুসিয়াস (৫৫১ খ্রি.পূ.—৪৭৯ খ্রি.পূ.), বুদ্ধদেব (৫৬৩/৪৮০ খ্রি.পূ. —৪৮৩/৪০০ খ্রি.পূ.), সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪—৪৩০), খলিফা ওমর (৫৮৩—৬৪৪), মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯—১৯৪৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১), আইনস্টাইন (১৮৭৯—১৯৫৫), আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯—১৮৬৫) প্রমুখ মনীষীর ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের নৈতিক কাহিনি আলোচিত হত।

● আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি কী কী?

■ যিনি ছেলে-মেয়েদের স্নেহ করেন এবং পড়ানোর কাজকে উপভোগ করেন, তিনিই আদর্শ শিক্ষক। তিনি সাধারণ মানের পড়ুয়ার কৃতিত্বপূর্ণ উন্নতিতে সক্ষম। তিনি শিক্ষকতাকে এক মহান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন। তিনি একজন শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র শিক্ষাদান করছেন না, সঙ্গে-সঙ্গে একজন আলোকিত নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তাও করছেন। এই শিক্ষার্থীই পরবর্তীতে দেশের প্রতি নিজ কর্তব্য পালনে, অনেকের মধ্যে এক হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত হবে।

● প্রতিদিন ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সুবিধা ক্রমবর্ধমান হওয়ার পরও ক্লাসরুম-শিক্ষার যৌক্তিকতা আছে কী?

■ ক্লাসরুমের শিক্ষাক্রম দূরশিক্ষা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। উভয়েই একে অন্যের পরিপূরক। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর

সমৃদ্ধীকরণে দূরশিক্ষা (টেলি এডুকেশন) ব্যবহৃত হতে পারে।

● আপনার কল্পনায় ২০২০ সালের ভারতীয় শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত?

■ প্রাথমিক শিক্ষার ক্রিয়াকেন্দ্র শিশুদের সৃজনশীলতা সচল রাখার ওপর হওয়া উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এর দ্বারা তারা নিজেদের ক্ষুদ্র কর্মোদ্যোগ গড়ে তুলতে বা উচ্চশিক্ষা বা গবেষণায় যেতে পারবে। উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রগুলির আন্তর্জাতিক মানের উৎকর্ষকেন্দ্র ও শিল্পের অংশীদার হওয়া উচিত।

● ছাত্রের পরিচয় কী?

■ একজন ছাত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তার প্রশ্ন করার ক্ষমতা। ছাত্রদের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ দাও।

বৈজ্ঞানিক স্পিরিট

অনুসন্ধিৎসাই সৃজনশীলতার ভিত্তি। এর সঙ্গে জিজ্ঞাসু মন বৈজ্ঞানিক মেজাজ সৃষ্টির পথ সুগম করে।

● দুনিয়ার প্রথম বিজ্ঞানী কে?

■ কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা দ্বারাই বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও টিকে

থাকা। বিজ্ঞানের পুরো ভিত্তিটাই প্রশ্ন করার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাবা-মা ও শিক্ষকগণ ভালো করেই জানেন যে, শিশুরাই বিরামহীন জিজ্ঞাসার মূল উৎস। অতএব, শিশুরাই প্রথম বিজ্ঞানী।

● সঠিক উপলব্ধির জন্য সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে?

■ এটাই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। কারণ, বিজ্ঞানই একমাত্র উপায়, যার দ্বারা মানবসমাজের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

● খোদার সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস করবে এমন মারণাস্ত্রের আবিষ্কারের কারণ?

■ প্রতিনিয়ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চক্রাকারে সৃষ্টি ও ধ্বংসকাজে নিয়োজিত। মানবজাতিকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে, প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রকৃতিজগৎকে ধ্বংস না করে, কেবলই মানবসমাজের উন্নয়নে যেন ব্যবহৃত হয়।

● ভারতীয়দের মাঝে বৈজ্ঞানিক মেজাজ সৃষ্টির পন্থা?

■ বিজ্ঞানীদের হতে হবে নাগরিক বিজ্ঞানী (সিভিক সাইন্টিস্ট) এবং তাদের এটা সুনিশ্চিত করতে হবে, বিজ্ঞানের সুফল সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত যেন পৌঁছোয়। এই প্রক্রিয়া যদি অনবরত চলে এবং জনসাধারণ তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে বিজ্ঞানের সুফল পায়, বৈজ্ঞানিক মেজাজ অবশ্যই গড়ে উঠবে।

● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্বরূপ?

■ বিজ্ঞান হল আমাদের চারপাশের ঘটমান বিষয় সম্পর্কে নিজ নিজ বুদ্ধি ব্যবহার করে উত্তর খুঁজে পাওয়া। ওইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের সহায়তায় বিকশিত পন্থাই প্রযুক্তিবিদ্যা।

● ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নতির পারস্পরিক সম্পর্ক?

■ অধিকাংশ ব্যক্তি, যাঁরা বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক। আইনস্টাইন (যিনি E=mc2 আবিষ্কার করেছেন) যখনই ছায়াপথ (গ্যালাক্সি) ও নক্ষত্ররাজি পর্যবেক্ষণ করতেন, তিনিও মহাবিশ্ব ও তার স্রষ্টার চমৎকারিত্বে বিস্মিত হয়ে যেতেন। নোবেল বিজয়ী ড. সি ভি রমন (১৮৮৮—১৯৭০) আধ্যাত্মিকতায় অনুরক্ত ছিলেন। আধ্যাত্মিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর হলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

● বেশ কিছু বিচ্যুতি-সহ বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ?

■ বিজ্ঞান বেকসুর। এটি অবশ্যই অভিশাপ নয়। আমরা বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করি, তার ওপরেই নির্ভর করছে বিজ্ঞান মঙ্গলময় না সর্বনাশী। যেমন, পারমাণবিক শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিংবা পরমাণু বোমা সৃষ্টিতেও ব্যবহৃত হতে পারে। কৃষিতে সার ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায়। আবার ওই একই রাসায়নিক ব্যবহার করে মারণাস্ত্রও তৈরি করা হয়। বিজ্ঞানের ওপর ভর দিয়ে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে। সমাজের অগ্রনায়কগণ ঠিক করেন কীভাবে ওই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে।

● ভারতের দারিদ্র্য হ্রাস বা নির্মূল করতে বিজ্ঞানের উপযোগিতা কতটা?

■ দারিদ্র্য বাস্তবিকই আমাদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এটাও বাস্তব— বিজ্ঞান দারিদ্র্য হ্রাস করতে আমাদের সহায়তা করছে। যেমন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বহু প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ গড়তে সহায়ক হয়েছে। এবং রিমোর্ট সেন্সিং প্রযুক্তি দ্বারা কৃষকগণ বহুভাবে উপকৃত।

● ধর্ম না বিজ্ঞানের প্রতি অধিক ভরসা?

■ ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই জীবনের সত্য ও বাস্তবতায় আমাদের নিয়ে যায়। ধর্ম আধ্যাত্মিকতার জন্য এবং বিজ্ঞান পার্থিব উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ই জীবনের জন্য জরুরি।

● পড়ুয়াদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বৃদ্ধির উপায়?

■ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করার অনুমতি ও সুযোগ আমাদের দিতে হবে। তাদের জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তরও ধৈর্য সহকারে দিতে হবে আমাদের। প্রশ্ন করার অভ্যাসকে নিষেধ করা উচিত নয়। অনুসন্ধিৎসাই সৃজনশীলতার ভিত্তি। এর সঙ্গে জিজ্ঞাসু মন বৈজ্ঞানিক প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক।

● একজন বৈজ্ঞানিকের জীবিকার সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ?

■ যাঁরা বৈজ্ঞানিক কর্মজীবনে আগ্রহী বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে গবেষণা করেন, তাঁরা জীবনের সুখ ভোগের জন্য এতে প্রলুব্ধ হন না। তাঁরা জগতে তাঁদের নিজস্ব গভীর আসক্তি ও বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেই আসেন।

● ভবিষ্যতের তরুণ প্রকৌশলীদের (ইঞ্জিনিয়ার) জন্য কিছু বলবেন?

■ তরুণ প্রকৌশলীগণকে জীবিকা শুরুর সময় নীচের প্রতিজ্ঞাগুলোর শপথ নিতে হবে:

১. ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমার জীবনভরের লক্ষ্য। কঠোর পরিশ্রম করব এবং সফল হব।

২. আমি যেখানেই থাকি, আমি এই সংকল্প নিয়ে কাজ করব— কোনো পদ্ধতি বা পণ্য আমি প্রবর্তন, উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করতে পারি কি না।

৩. আমি সবসময় মনে রাখব, আমার হাওয়ায় ওড়া দিনগুলো যেন বৃথা না চলে যায়।

৪. আমি উপলব্ধি করি, আমার একটি প্রযুক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। উচ্চ সংকল্প ও অধ্যবসায়ী কঠোর পরিশ্রম ওই লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছোবে।

৫. আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মহান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদগণ, যোগ্য শিক্ষক ও উপযোগী বইপত্র।

৬. আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোনো সমস্যাই আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। ওই সমস্যাকে পরাজিত করে আমি বিজয়ী অধিনায়ক হব।

৭. আমি জগতের জল, শক্তি, আবাসস্থল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ প্রভৃতি নানান সমস্যা থেকে দেশ ও সমাজকে মুক্ত রাখতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে সচেষ্ট থাকব।

৮. দেশের জাতীয় পতাকা আমার হৃদয়ে থাকবে উড্ডীয়মান। মাতৃভূমির জন্য সাফল্য আনব।

● একজন বিজ্ঞানী সৃষ্টির উপায়?

■ তিরিশ শতাংশ মনীষা আর সত্তর শতাংশ কঠিন পরিশ্রমের সংমিশ্রণের ফল।

তারুণ্যের স্পিরিট

সততার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন এবং শুদ্ধতার সঙ্গে সফলতা অর্জন— এটাই তোমাদের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সমাজ উন্নয়নের এটিই একমাত্র পথ।

● ছেলে-মেয়েদের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগের কারণ?

■ তরুণদের স্বপ্ন ও জিজ্ঞাসু মন আছে। তোমাদের মহত্ত্ব, অনুসন্ধিৎসা, অঙ্গীকার, আন্তরিকতা ও উদ্‌বেগ দেশকে মহান করবে। এভাবে তুমি নিজেও মহৎ হতে পারো।

● এখনকার এবং আপনার সময়ের ছেলে-মেয়ের পার্থক্য কী?

■ এখনকার বাচ্চারা খুবই জিজ্ঞাসু এবং তারা দ্রুত ফল প্রত্যাশা করে। তাদের গৌরবাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল।

● তরুণদের দেশপ্রেম ও সেবার মনোভাব জাগানোর পদ্ধতি?

■ এটা তরুণদের সমস্যা নয়, এটা পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের সমস্যা। কিশোর ও তরুণ সম্প্রদায় অবশ্যই দেশপ্রেমী, কিন্তু পিতা-মাতা ও বয়স্কদের দেশের প্রতি মনোভাবে পরিবর্তন আনতে হবে। বাবা-মা যদি দেশপ্রেমী হন, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা আমাদের দেশীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ছেলে-মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের অনুসরণ করবে।

● বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে, একদিকে বাবা-মা ও শিক্ষকের চাপ, সিলেবাসের বোঝা, টেনশন এবং অন্যদিকে সমাজের হীন মানসিকতা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানকীর্তির সম্ভাবনা কতটুকু?

■ অন্যান্যদের মতামতকে পাত্তা না দিয়ে, যে-বিষয় ও কর্মের প্রতি তোমার স্বাভাবিক প্রবণতা ও অনুরাগ, তাতেই তোমাকে মনস্থির করতে হবে। এভাবেই সর্বোত্তম সফল ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

● তরুণসমাজের প্রতি অনুপ্রেরণাদায়ক কথা কিছু বলবেন?

■ দেশের তরুণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমার একটি বিশেষ বার্তা আছে। প্রত্যেক যুবকের অদম্য তেজ থাকা উচিত। অদম্য তেজ বা উদ্দীপনার দুটি উপাদান থাকে। প্রথমত, তোমাদের একটি লক্ষ্য থাকা উচিত এবং ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করো। দ্বিতীয়ত, কাজ করার সময় তোমরা নিশ্চিতরূপেই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবে। এই অবস্থায় সমস্যা যেন তোমার শাসক না হয়ে যায়। পরিবর্তে তুমি সমস্যার মালিক হও, তাদের পরাস্ত করো এবং বিজয়ী হও। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে তরুণ জনসংখ্যার এক

বড়ো সম্পদের ভাণ্ডার আছে। এইসব তরুণের প্রজ্বলিত চেতনা, অন্যান্য সম্পদের তুলনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অদম্য তেজস্বিতার ওপর ভর করে যখন তরুণদের প্রজ্বলিত মেধা যেকোনো কাজ সম্পন্ন করে তখনই এক সমৃদ্ধ, সুখী ও নিরাপদ ভারত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

● আমি এগারো বছরের এক বালিকা। দেশের সমস্যা সমাধানে আমার অবদান কী হবে?

■ তোমার প্রথম কাজ ভালোভাবে পড়াশোনা এবং লেখাপড়ায় উৎকর্ষ অর্জন। ছুটির সময় তোমার যদি সময় থাকে, তুমি নিরক্ষর দু-জনকে পড়াতে পারো। তোমার আশেপাশে বা বিদ্যালয়ে দুটো চারাগাছ লাগানো ও তার দেখভাল করতে পারো তুমি। তুমি জল ও বিদ্যুৎশক্তির অপচয় রোধ করার প্রচেষ্টা চালাতে পারো। তোমাদের বাড়ির আশপাশ ও সন্নিহিত এলাকা দূষণমুক্ত ও সবুজ রাখতে তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করতে পারো।

● পূর্বপুরুষ, পারিবারিক, দেশের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকদের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে আমাদের জন্য অনুসৃত মূল্যবোধ কোনটি?

■ এরকম কিছু নেই যে, মূল্যবোধ কেবলমাত্র চার রকমের। মূল্যবোধ হল বিশ্বজনীন এবং সকলের জন্য তার রূপ একই। ন্যায়পরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা, দেওয়ার মনোভাব, স্বচ্ছতা, সবার সঙ্গে একইরকম ব্যবহার করা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলির অনুশীলন ও অনুসরণ করা উচিত আমাদের।

● বাচ্চা ও তরুণদের সঙ্গে আপনার একাত্মতার রহস্য?

■ উভয়েই সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন। এরা নিয়তই প্রশ্ন করে। এরাই দেশের ভবিষ্যৎ।

● বর্তমান প্রজন্মের তরুণ পেশাদার গোষ্ঠী নিয়ে আপনার মত?

■ আমি গত সাত বছরে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি ছাত্র-যুবার সঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং প্রতিদিন বহু ই-মেলও পেয়েছি। তারা সবাই প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছল। আমাদের উচিত শিক্ষা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে তাদের সক্রিয় ও ক্ষমতায়ন করা।

● শিক্ষার্থী ও যুবসম্প্রদায়ের জন্য আপনার বিশেষ বার্তা?

■ তাদের প্রতি আমার বার্তা হল, তাদের মধ্যে অন্যভাবে চিন্তা করার সাহস থাকা জরুরি, উদ্ভাবনের শক্তি, অজানা পথে চলার মতো আবিষ্কারের উৎসাহ এবং সমস্যাকে জয় করে সাফল্য লাভের ক্ষমতা। এই গুণগুলিকে বাড়িয়ে তুলতেই তাদের পরিশ্রমী হতে হবে।

সাফল্যের স্পিরিট

সাফল্য তখনই সম্ভব, যখন আমরা কাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হই। 'স্বপ্ন বোনা, চিন্তা করা, কর্মনিষ্ঠ হওয়া' এই দর্শন আমি প্রত্যেক ভারতীয়র মনের ভেতর গেঁথে দিতে চাই।

● নিজের লক্ষ্য পূরণ করা না অন্যের প্রত্যাশা কার্যকর করা উচিত?

■ নিজের স্বপ্নই একজনের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। একজনের যা পছন্দ, সেটাই তার করা উচিত।

● আদর্শ মানুষ হওয়ার পথ?

■ ভালো বই, আদর্শ শিক্ষক, সৎ মানুষজন এবং ভালো বন্ধুদের সাহচর্যে আদর্শ মানুষ হওয়া সম্ভব।

● নিয়মানুবর্তী হওয়া, পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া, সৎ হওয়া, কঠোর পরিশ্রম করা— এসবের মধ্যে একজন কিশোরের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুণ কোনটি?

■ একজন কিশোরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল নিজের কাছে সৎ এবং অন্যদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। এটাই তোমাকে আলোকিত নাগরিক হতে সহায়তা করবে।

● আপনার সাফল্যের রহস্য?

■ স্বপ্ন, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। তোমার জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তা অর্জন করো। কাজ করতে গেলে নিশ্চিতরূপেই তোমার সঙ্গে কিছু সমস্যার সাক্ষাৎ ঘটবে। সাহসী হয়ে সমস্যার মোকাবিলা করে তা অতিক্রম করতে হবে। খোদা যদি আমাদের সহায় হন, আমাদের বিরুদ্ধে কে থাকতে পারে?

● জীবনের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য অর্জনের সমস্যা?

■ লক্ষ্যের প্রতি তোমার অবিচল একমুখী শ্রদ্ধাই তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে। আমি কখনোই হাল ছাড়ব না এবং সমস্যা যেন আমাদের হারিয়ে না দেয়।

● কাজের সঙ্গে মনের সম্পর্ক?

■ যারা আন্তরিকভাবে কাজ করে না, তারা যা অর্জন করে, তা শূন্য বই কিছু নয়। উৎসাহহীন কাজ চারপাশে কেবল তিক্ততাই সৃষ্টি করে।

● ভাগ্যের সহায়তা না কঠোর পরিশ্রম জরুরি?

■ প্রথমেই প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম। কঠোর পরিশ্রমে অটল থাকলে নসিবের আনুকূল্য তুমি পাবে।

এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত বাণী হল— খোদা তাদেরই সহায়তা করেন, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে।

● স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ, ব্যর্থতার ভীতি থেকে মুক্তির উপায়, আত্মবিশ্বাসী হওয়ার নিয়ম?

■ জ্ঞানের আহরণ তোমাকে আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করবে। ব্যর্থতা নিয়ে আমাদের শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। ব্যর্থতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং পরবর্তী ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পেতে এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। এভাবেই তুমি সাফল্য পাবে। নিজস্ব করণীয় কাজে তোমার মনোনিবেশ ঘটলে অলসতা থেকে বাঁচা যায়।

● শুনেছি বিজ্ঞানীদের মেধাবী মস্তিষ্ক থাকে। আমাদের বুদ্ধিমান মগজ গড়ার উপায়?

■ অনুসন্ধিৎসু হও, নিরন্তর প্রশ্ন করো এবং সঙ্গে-সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম চাই। এর পরের সবকিছুই আপনা-আপনি ঘটতে থাকবে।

● টাইম ম্যানেজমেন্ট (সময় ব্যবস্থাপনা) বিষয়ে কিছু বলবেন?

■ তোমরা সবাই জান পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় বা চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিটে বা ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ডে অর্থাৎ একদিনে নিজ অক্ষ বরাবর একবার আবর্তিত হয়। আবার সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘুরতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর এক আবর্তনের শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার বয়সের

এক বছর বেড়ে যায়। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন ও বছর এভাবেই চলে যায়। এদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। একটিমাত্র কাজ আমরা করতে পারি, সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে-সঙ্গে সময়ের সদ্ব্যবহার ও পরিচালনা করা। মনে রেখো, হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো দিনগুলি যেন বিফলে না যায়।

● তকদির না নিজের কর্মপ্রচেষ্টা?

■ তুমি এখন যা, তা তোমার তকদির। তুমি আজকে যা করছ, আগামীকাল সেটাই তোমার কর্মফল দ্বারা নির্ধারিত হবে।

● স্বপ্ন দেখা না পরিকল্পনা করা?

■ স্বপ্নের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প ও অভীষ্ট লক্ষ্য থাকলে সেই স্বপ্নের দ্বারা সফলতা আসে। জীবনের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। পরিকল্পনা হল এমন এক কৌশল, যা আমাদের সক্ষম করে প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে।

● আপনি একবার বলেছিলেন, জীবন হল অমীমাংসিত সমস্যা, অনিশ্চিত বিজয় ও নিরাকার পরাজয়ের সংমিশ্রণ। এ-ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়?

■ জীবনে কোনো সময় নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। যে-পরিস্থিতিতেই সমস্যা আসুক-না-কেন, তোমাকে তার চালক হয়ে সেটাকে পরাস্ত করে বিজয়ী হতে হবে।

● যোগ্য জননায়ক হওয়ার পথ?

■ একজন যোগ্য অগ্রনেতা হতে গেলে, তোমার মধ্যে যে-গুণাবলির অনুশীলন করতে হবে, তা হল— অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীলতা, একাগ্রতা, সচ্চরিত্র, সাহসিকতা, অনন্যসাধারণ প্রতিভা, কাণ্ডজ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও প্রত্যয়।

● জ্ঞানার্জন জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, কিন্তু কর্মজীবনেও তা চালিয়ে যাওয়ার কৌশল?

■ হ্যাঁ, জ্ঞানার্জন এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। যখন তুমি তোমার জীবিকার সূচনা কর, তোমার সঙ্গে এক

নতুন পরিস্থিতির পরিচয় ঘটে। প্রচলিত পথে না গিয়ে চেষ্টা করো, সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতির উদ্ভাবন দ্বারা ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার। এতে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সৃজন ঘটবে। জ্ঞানের স্বোপার্জনের এই পদ্ধতি তোমাকে জীবনভর জ্ঞানার্জনে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

● জীবনের অসংখ্য সমস্যা মোকাবিলায়, আপনার অধিক ক্ষমতা অর্জনের রহস্য?

■ ক্ষমতা বিকশিত হয় জ্ঞানের স্বোপার্জন এবং যেকোনো সম্ভাব্য পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকার ওপর।

● বাধা ও ব্যর্থতা সামলানোর উপায়?

■ যখন আমরা প্রতিবন্ধকতা সামলাই, তখনই আমরা বুঝি, আমাদের সুপ্ত শক্তি ও সাহসের কথা। আমরা আগে যা জানতাম না। এবং যখনই আমরা ব্যর্থতার মুখোমুখি হই, তখনই বুঝতে পারি, এই সম্পদগুলি আমাদের মধ্যে চিরকালই ছিল। আমাদের কাজ শুধু সেগুলোকে খুঁজে নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলা।

● মহৎ মনীষীর নানা কথা শোনা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার বিষয়। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা তাঁদের নাগাল পায় না। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায়?

■ মহৎ মনীষীর লেখা বইপত্র বা অন্তর্জাল (ইন্টারনেট) থেকে তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারো। এ ছাড়া তোমরা তোমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করেও অনেক কিছুই জানতে পারো।

● আপনার সবকিছুতেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের কারণ?

■ সফলতার এটিই একমাত্র পথ।

● একজন আদর্শ মানুষ আপনি। আমরাও ভালো মানুষ হতে চাই। আপনার মতে আমাদের করণীয়?

■ কঠোর পরিশ্রম ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মেজাজের মিলিত রূপই তোমাকে ভালো মানুষ হতে সাহায্য করবে।

● বর্তমানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রটি মেধাবী ছাত্রদের দখলে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মেধার ছাত্রদের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ কতটুকু?

■ প্রথমে তোমার মন থেকে এটা অবশ্যই ঝেড়ে ফেলে দাও যে, তুমি একজন সাধারণ মানের শিক্ষার্থী। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অনন্য শক্তি আছে। অনুগ্রহ করে ওই শক্তিকে স্বীকার করো, মনযোগী হও এবং কঠোর পরিশ্রম করো। আমি নিশ্চিত তুমি সফল হবে এবং তোমার পছন্দসই ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুমি অন্যকে টক্কর দিতে পারবে।

কালাম স্পিরিট

মানুষের চিন্তাশক্তি এক অনন্য উপহার। আমাদের জীবনযাত্রায় উত্থান ও পতন যাই ঘটুক-না-কেন, চিন্তাশক্তিই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হওয়া উচিত। চিন্তাশক্তিই অগ্রগতি। চিন্তা থেকেই আসে কর্মশক্তি। কর্মহীন জ্ঞান অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। জ্ঞান ও কর্মের যোগফলই সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে এবং সমৃদ্ধি আনে।

● এখন আপনি ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং আগে ছিলেন ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)-এর বিজ্ঞানী। অভিজ্ঞতার মিল ও অমিল?

■ উভয় পদেই কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় কোনো পার্থক্য নেই।

● বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, যেখানে দুনিয়ার এক ষষ্ঠাংশ মানুষের বসবাস, তার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে আপনার অনুভূতি?

■ আমার বেশ ভালোই লেগেছে। দায়িত্ব ও কর্তব্য আমার একসঙ্গেই চলেছে।

● সমতারক্ষা, উদ্‌বেগহীনতা, আশাবাদ প্রভৃতি আপনার জীবনে খুবই সুস্পষ্ট। আমাদের জন্য এগুলি অর্জনের প্রক্রিয়া?

■ আমি নিজের করণীয় একটা বা অনেক কাজে নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখি।

● মানুষের স্মৃতিতে আপনি থাকতে আগ্রহী— রাষ্ট্রপতি হিসেবে না বিজ্ঞানী হিসেবে?

■ একজন ভালো মানুষ হিসেবে।

● দ্বিতীয় বার সুযোগ পেলে আপনি রাষ্ট্রপতি না বীণাবাদক হতে আগ্রহী?

■ দ্বিতীয় বার যদি সুযোগ পাই, তবুও আমি একজন শিক্ষক হতে আগ্রহী। রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে আমি একজন শিক্ষক ছিলাম এবং মেয়াদ শেষ হলে আমি আবার শিক্ষকতায় ফিরে যেতে চাই।

● ছোটোবেলায় আপনার চিন্তায় ছিল কি আপনি একদিন এত উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হবেন?

■ একেবারেই না। একাধিক কাজের কর্মদক্ষতায় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। এবং অবশ্যই করেছি কঠোর পরিশ্রম, কঠোর পরিশ্রম, কঠোর পরিশ্রম।

● ভারতরত্ন পেয়ে আপনার অনুভূতি? আমিও পেতে আগ্রহী। আমার করণীয়?

■ আমার জীবনের বহু ঘটনার মাঝে ভারতরত্ন সম্মান পাওয়া আরও একটি ঘটনামাত্র। ভারতরত্ন নিয়ে তুমি বিচলিত হয়ো না। যে-কাজ তুমি করছ, তা মনপ্রাণ দিয়ে করো, পরিশ্রম করতে থাকো, দাতা হও, যতটা সম্ভব অন্যের সেবা করো। এতেই তুমি আনন্দ পাবে এবং সফল মানুষ হবে।

● খোদার কাছে আপনার বিশেষ প্রার্থনা?

■ আমি সর্বশক্তিমান খোদার কাছে প্রার্থনা করব, আমার দেশকে কঠোর পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান মানুষ দিয়ে ভরিয়ে দিতে। কারণ, এরাই আমাদের জন্মভূমিকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

● উৎকর্ষের সংজ্ঞা?

■ উৎকর্ষ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

● বিদ্যালয়ে আপনার প্রিয় বিষয় ও তার কারণ?

■ বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয় ছিল। এটির সাহায্যে আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি, প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট ঘটমান বিষয় কীভাবে ঘটছে।

● আপনার গড়ে ওঠার পেছনে কাদের প্রভাব সর্বাধিক? যাঁরা আপনাকে নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়েছেন, না যাঁরা আপনাকে বিভিন্ন বিষয় পড়িয়েছেন?

■ আমি আমার শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত স্মরণ করি। আমার বাবা আমার প্রথম শিক্ষক, যিনি আমাকে নিয়মানুবর্তিতা ও জীবনের মূল্যবোধ শিখিয়েছেন। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীশিবা সুব্রহ্মণ্য আয়ার আমাকে বিমানচালনাবিদ্যা পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই প্রথম আমাকে প্রভাবিত ও জীবন গড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

● আপনার সহজ সরল জীবনযাপনের রহস্য, যদিও আপনি রাষ্ট্রপতি?

■ আমার চাহিদা খুবই অল্প।

● জীবন থেকে আপনার শিক্ষণীয় বিষয়?

■ জীবন এক চলমান স্রোতধারা। প্রতিটি দিনই অনন্য এবং প্রত্যেক কর্মেরই নিজস্ব চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের উচিত নিজ নিজ কাজকে ভালোবাসা এবং এর প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করা।

● আপনার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত?

■ হালকা এফআরও (ফ্লোর রিঅ্যাকশন অর্থোসিস)* পরে পোলিয়ো-আক্রান্ত শিশুদের আনন্দোচ্ছ্বাস— লাফালাফি ও দৌড়াদৌড়ি আমাকে চরম আনন্দিত করেছিল। একশো তিন ও তিরানব্বই বছরে, যদিও পরিণত বয়সে, তিন মাসের ব্যবধানে আমার বাবা-মায়ের মৃত্যু আমার দুঃখতম সময়।

● একজন মানুষের সবচেয়ে উত্তম কাজগুলি?

■ ক্ষুধার্থকে খাদ্যদান, আর্তের সেবা, দুঃখীর কষ্ট লাঘব, আহতের শুশ্রূষা ও মানুষের হৃদয়ে আনন্দসঞ্চার— এগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম।

● নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার সময় আপনি কোনো পরামর্শ নিতেন, না নিজেই সেটা করতেন?

■ অভিজ্ঞতা এক বড়ো ভাণ্ডার। তোমার উচিত ওই ভাণ্ডার থেকে নিয়মিত গ্রহণ করা।

● নীল জামা পরার কারণ?

■ আশমানের রং নীল। আমি আকাশ ও আকাশের বিস্ময়কে ভালোবাসি।

● স্বপ্ন না পরিশ্রম অথবা স্বপ্ন ও পরিশ্রম?

■ আকশের দিকে তাকাও। আমরা একা নই। সমগ্র মহাবিশ্বই আমাদের বন্ধু। শ্রেষ্ঠ জিনিসটি তারাই পারে, যারা স্বপ্ন দেখার সঙ্গে-সঙ্গে পরিশ্রমও করে।

● জীবন মানে?

■ জীবন বড়ো জটিল বিষয়। মানুষ হয়ে ওঠার তোমার জন্মগত অধিকারের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই তুমি জীবনকে জয় করতে পারো।

● আপনার অদ্ভুত হেয়ার স্টাইলের কারণ?

■ চুল বড়ো হয়, তাই!

● আপনার প্রতি খোদার উপহার বা সৌভাগ্য, যার জন্য আপনার মুখমণ্ডলে ঔজ্জ্বল্য এবং আপনার কাজে তার ঝলক দেখা যায়।

■ আমার জন্য বিশেষ উপহার আমার বাবা-মা। তাঁরা আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হওয়ায়, আমি তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই। এটাই আমার জন্য খোদার উপহার ও আশীর্বাদ।

● প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে থাকে এক মহিলা। কিন্তু আপনি তো অবিবাহিত। আপনার সফলতার রহস্য?

■ আমি যেহেতু যৌথ পরিবার থেকে এসেছি, আমার সাফল্যের অংশীদার আমার বাবা, মা, ভাই, বোন-সহ আমার গোটা পরিবার, শিক্ষাগুরু এবং ভারতের সমস্ত নাগরিক।

● আপনার স্কুলজীবনের দুষ্টুমির কথা?

■ আমাদের প্রধান শিক্ষক একদিন ভূগোল পড়াচ্ছিলেন। ক্লাস চলাকালীন সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা কয়েক জন খুব মনোযোগী নই। তিনি বললেন, আমাদের চলন্ত ট্রেনে চড়া উচিত। আমি সঙ্গে-সঙ্গে

উত্তর দিলাম, চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করলে আমরা পড়ে যাব এবং আহত হব। এ-কথা শুনে তিনি আমাকে সজোরে বেত্রাঘাত করেছিলেন! প্রকৃতপক্ষে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর পড়াবার সময় পড়াশোনার প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু আমি তা না ভেবে শারীরিকভাবে চলন্ত ট্রেনে উঠতে হবে বলে ভেবেছি!

● আপনার সবচেয়ে পছন্দের কাজ?

■ ছোটোদের সঙ্গে কথা বলা ও আলোচনা করা এবং তাদের স্বপ্ন উপলব্ধি করা।

● আমরা আপনার কাছ থেকে বহু বিষয় শিখছি। আমরা ছাত্র, আমাদের কাছ থেকে আপনার শেখার বিষয়?

■ প্রশ্ন করার গুরুত্ব।

● আপনার বেশি পছন্দ বিজ্ঞান না বাচ্চারা এবং তার কারণ?

■ উভয়কেই বেশি পছন্দ করি, কারণ, আমি প্রত্যেকটি বাচ্চার মধ্যে একজন বিজ্ঞানীকে দেখি।

● আপনার অধিকতম ভালোবাসার পাত্র?

■ স্রষ্টার পরে স্রষ্টার সৃষ্টিকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

● একটি প্রযুক্তি, উদ্ভাবন বা আবিষ্কার, যা সবচেয়ে বেশি আপনাকে অভিভূত করেছে?

■ বিদ্যুৎ আবিষ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

● একটি নির্ধন পরিবারের সন্তান হয়েও কাজের মাধ্যমে উপার্জন না করে পড়াশোনা করার কারণ?

■ পড়াশোনার ব্যাপারে আমার বাবা-মা ও শিক্ষকগণ খুবই সহায়ক ছিলেন। তাঁরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন।

● আপনার পছন্দের খাদ্য?

■ আমি নিরামিষাশী। আমি সবরকম ভারতীয় খাবার পছন্দ করি।

● আপনার জীবনসংগ্রাম অন্যের জন্য আদর্শ না অনুপ্রেরণা?

■ আমি এ-কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাব না যে, আমার জীবন কারোর কাছে আদর্শ হতে পারে, কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের সামাজিক সুবিধাহীন পরিবেশের কোনো গরিব শিশু, সে হয়তো আমার জীবনসংগ্রাম জেনে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারে। হয়তো হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারে।

● আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য?

■ একশো কোটি ভারতবাসীর মুখে হাসি দেখা।

এটা সুবিদিত যে, এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর বহু সত্তার মধ্যে শিক্ষকসত্তাকে খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর কর্মজীবনের নানা পর্বে এই পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ হামেশাই দেখা যায়। চিরবিদায়ের মুহূর্তেও তিনি শিক্ষক ছিলেন। ২০১৫-র ২৭ জুলাইয়ের সন্ধ্যায় শিলঙের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম)-এ তিনি পৌঁছোন। উপলক্ষ্য ছাত্রদের একটি কোর্স করানো, যার নাম ছিল— মেকিং দ্য আর্থ এ লিভিং প্লানেট (পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য গ্রহে পরিণত করা)। এই বক্তৃতা শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি তিনি। মহাপ্রস্থান ঘটে তাঁর। বিদায়কালেও তাঁর চারপাশে ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকুল। চোখের সামনে ঘটা কালামের চিরবিদায় নিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'তিনি ছিলেন একজন আদ্যন্ত শিক্ষক। ভাগ্য তাঁকে তাঁর জীবনের যোগ্য উপসংহারই দান করেছে। মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'

বাচ্চা, পড়ুয়া ও তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তাদের নিয়ে তাঁর ছিল বহু স্বপ্ন।

যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, পূর্ণাঙ্গ জীবনমুখী শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করার ওপর জোর দিতেন তিনি। কিন্তু তবুও তাঁর মূল সুরটি বাঁধা ছিল মাস্টারমশাইদের জন্য, যাঁরা আদর্শ নাগরিক গড়ার কারিগর। একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকের গুণাবলি ও করণীয় নিয়ে আবদুল কালাম আলাপ আলোচনা এবং নানান সভায় শিক্ষকদের শপথও করাতেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই বিষয়গুলি হল: একজন শিক্ষক শিক্ষকতাকে ভালোবাসবে। শিক্ষকতা তাঁর পেশা হলেও, এটিকে তাঁর প্রাণ ভাবতে হবে। তাঁদের দায়িত্ব শুধু ছাত্র নয়, আলোকিত যুবসমাজ গঠন, যারা বিশ্বের সেরা সম্পদ। শিক্ষকতার প্রতি তাঁরা সমর্পিত হবেন। গড়পড়তা ছাত্রকে সেরা বানানোতেই বড়ো শিক্ষক হওয়ার সার্থকতা। শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের মা, বাবা, ভাই, বোনের মমতায় দেখবেন। তাঁদের জীবনযাপন থেকে যেন শিক্ষা নিতে পারে পড়ুয়ারা। ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসু হতে ও প্রশ্ন করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে, যাতে তারা সৃজনশীল হয়। সব ছাত্রকে সমান চোখে দেখতে হবে— ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি ও ভাষার বিভেদ করা যাবে না। ছাত্রদের সেরাটা দেওয়ার জন্য শিক্ষকতার মান উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে। ছাত্রদের সফলতার উদ্‌যাপন জরুরি। শিক্ষকতার মাধ্যমে জাতির উন্নয়নে সামিল হওয়ার উপলব্ধি থাকা চাই। শিক্ষকদের মন ও মানসিকতা থাকবে মহৎ চিন্তায় পূর্ণ, ভাবনা ও কাজের মাধ্যমে যার প্রসার ঘটবে। জাতীয় পতাকাকে হৃদয়ে ধরে রেখে দেশের সম্মান বাড়াবার অঙ্গীকার করতে হবে।

দেশের শিক্ষা ও শিক্ষককুল নিয়ে তিনি নিয়ত চিন্তামগ্ন থাকতেন, কারণ, তিনি নিজেও এক অতুলনীয় শিক্ষাগুরু। অনেকেই তাঁর শিক্ষকসত্তার ও দেশভক্তির কথা সশ্রদ্ধচিত্তে আলোচনা করেছেন। কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর, বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ড. বিকাশ সিনহা রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আবদুল কালামের সঙ্গে বহুবার মিলিত হয়েছেন। তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি লেখেন, 'সদাসর্বদা চঞ্চল, একমুহূর্ত নষ্ট করতে নারাজ মানুষটিকে মনে হত, তিনি যেন তাড়িত হচ্ছেন, যেন তাঁকে অনেক কিছু করতে হবে, অর্জন করতে হবে, অথচ সময় বয়ে যাচ্ছে।

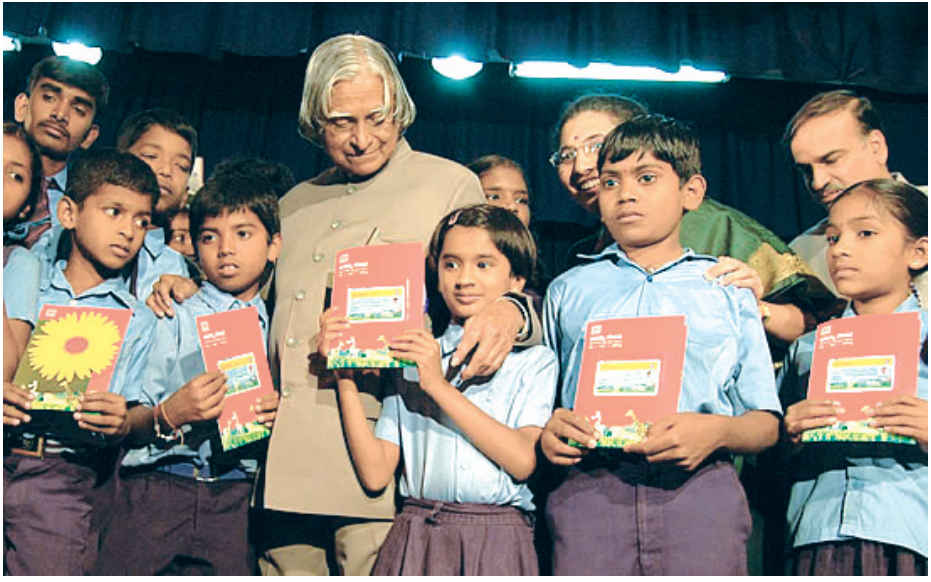

কালাম সাহেবের কোনো অসন্তোষ ছিল না, তিনি ছিলেন সরল ও ভয়হীন, তাঁর মধ্যে কোনো যুদ্ধং দেহি ভাব ছিল না। চলার পথে নানা দায়িত্ব নেবার পক্ষে তাঁর কাঁধদুটি ছিল যথেষ্টই চওড়া। তিনি ছিলেন শান্ত অথচ সদা উত্তেজিত।' এরকম একজন মানুষের দেশহিতৈষণা থাকাই স্বাভাবিক। শিশু থেকে বৃদ্ধ, গ্রামীণ ও শহুরে, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ভারতবাসীর সার্বিক উন্নয়নই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে সফল করতেই তিনি শান্ত অথচ সদা উত্তেজিত থাকতেন। মানুষের জন্য অকৃত্রিম দরদী এই মনীষী দেশের জন্য যা করতে পেরেছেন, পরিকল্পনা সাজিয়েছেন তার বহু গুণ। দেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত করতে তাঁর কর্মপরিকল্পনা হল: নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে ব্যবধান ন্যূনতম করা, পরিস্রুত জল ও বিদ্যুৎশক্তির ওপর প্রত্যেকের সমানাধিকার, নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে নিয়মিত ধন উৎপাদনের মাধ্যমে উচ্চমানের

কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা বাধ্যতামূলক আইনকানুনের জন্য মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণের পথ রুদ্ধ না করা, দেশকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও বিনিয়োগকারীর গন্তব্যস্থল হিসেবে গড়া, সবার জন্য থাকবে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ এবং কঠিন ও জটিল রোগের সংখ্যা কমিয়ে আনা, সেরা প্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হবে এবং শাসনপ্রণালী সরল ও সহজলভ্য, ফলত দুর্নীতিমুক্ত হবে, দারিদ্র্য একেবারে নির্মূল করা, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি, নারীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা প্রভৃতি। এভাবেই গড়ে উঠবে আমাদের দেশ, যা হবে সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শান্তিপূর্ণ, সুখী ও ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসরমান। এবং বিশ্বের মধ্যে বসবাসের পক্ষে অন্যতম সেরা ও সমস্ত ভারতীয়র মুখে হাসি ফোটাতে যা হবে সক্ষম।

এতসব চিন্তাভাবনা ও কর্মব্যস্ততার মাঝেও আবদুল কালাম নিয়ম করেই প্রতিনিয়ত সংবাদ ও সাময়িকপত্র এবং বই পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। বই পড়া নিয়ে তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে বই সর্বদাই ছিল আমার আপনজন। এদের অনেককেই খুঁজে পেয়েছিলাম যখন আমি খুব ছোটো। তারা ছিল আমার বন্ধুর মতো, যারা আমাকে হাত ধরে জীবনের পথে কীভাবে চলতে হয়, তা শিখিয়েছে। তাদের কথা বহু পরিস্থিতিকে বুঝতে আমায় সাহায্য করেছে, তাদের সাহায্যেই আমি আমার চারপাশের পৃথিবীকে চিনে নিতাম।' কালামের কাছে গ্রন্থ ছিল ফ্রেন্ড, ফিলজফার ও গাইড। নিজস্ব মেধা, বৈচিত্র্যময় দীর্ঘ কর্মজীবনের সুবিশাল অভিজ্ঞতা, অসংখ্য বই এবং পড়ুয়া ও যুব সম্প্রদায়ের অজস্র প্রশ্ন দিয়ে গড়া তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল দেশের অগ্রগতিতে সমর্পিত। তিনি ছিলেন জ্ঞানের আধার, কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলিত রূপই আমাদের দেশের মাথা থেকে উন্নয়নশীল তকমা সরিয়ে উন্নত করতে সক্ষম। এটি ত্বরান্বিত করতে তিনি বই লেখা থেকে দেশের উচ্চপদস্থ নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মত বিনিময় করেছেন। একেবারে নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে দেশের শীর্ষতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর বক্তৃতায় ও আলাপ-আলোচনায়।

শুধু পড়ুয়া ও যুব সম্প্রদায় নয়, তাঁর কথোপকথনে মুগ্ধ হননি, এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। বাংলা কিশোরসাহিত্যে জনপ্রিয় কাকাবাবু চরিত্রের অমর স্রষ্টা, কবি ও সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও (১৯৩৪—২০১২) আবদুল কালামের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জীবনে আমি অনেক বক্তৃতা শুনেছি, বেশ কিছু শুনতে বাধ্যও হয়েছি। কিন্তু এমন অভিনব, মর্মস্পর্শী ও মজার বক্তৃতা জীবনে শুনিনি। শোনার পর থেকেই সে-অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য ছটফট করছি।' ওই বক্তৃতায় কালামের গ্রন্থপ্রীতির এক নতুন রূপ দেখে তিনি খুবই মজা পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তাঁর সভায় উপস্থিত সবাইকে কালাম বিভিন্ন বিষয়ের শপথ পাঠ করাতেন।

সে-দিনের সভার একটি বিশেষ শপথ নিয়ে সুনীলবাবু লিখেছেন, 'শেষ শপথটির কথা না বললেই নয়। সেটা এরকম: ১. আজ থেকে আমার বাড়িতে অন্তত কুড়িটি বই নিয়ে একটা লাইব্রেরি চালু করব, যার মধ্যে দশটি বই থাকবে বাচ্চাদের জন্য। ২. আমার মেয়ে আর ছেলে বাড়ির সেই লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলবে অন্তত দুশোটিতে। ৩. আমার নাতি-নাতনিরা সেই বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলবে অন্তত দু-হাজারে। ৪. আমাদের বাড়ির লাইব্রেরিটিই হবে আমাদের পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। ৫. আমরা পরিবারের সবাই মিলে সেই লাইব্রেরিতে প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা সময় কাটাব। কালাম আরও জানালেন যে, তামিলনাড়ুর এক বইমেলায় তিনি প্রায় দু-লক্ষ মানুষের এক সমাবেশে শ্রোতাদের এই শপথ পাঠ করিয়েছিলেন। তারপর অনেকেই তক্ষুনি একসঙ্গে কুড়িখানা বই কেনার জন্য ছুটে যায়। বইমেলার অনেক দোকানই খালি হয়ে গেল এর ফলে।' অবিশ্বাস্য! কালাম এফেক্ট।

ড. এ পি জে আবদুল কালামের জীবনের প্রতিটি পর্বই অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যা করেছেন, যা বলেছেন বা যা লিখেছেন, সবকিছুতেই আছে সমাজে মনুষ্যত্ববোধ ও শুভবোধ জাগরণের নিরন্তর প্রচেষ্টা। এই সংকল্পে তিনি একদিকে রেখেছেন বিদ্যাভ্যাসী এবং অন্যদিকে বিদ্যাদাতাদের। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মেলবন্ধনে এক শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষই ছিল তাঁর চিরকাঙ্ক্ষিত। শিক্ষাগুরুদের প্রতি তাঁর

আহ্বান, দেশের কোটি কোটি পড়ুয়াদের প্রতি তাঁরা যেন সংবেদনশীল দায়িত্বসচেতনতার পাশপাশি তাদের অভিভাবকও হতে পারেন। এ-বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী অনুধাবন হল, 'শিক্ষা প্রকৃত অর্থে সত্যের অন্বেষণ। শিক্ষক একেবারে কেন্দ্রীয় অংশ, যাঁকে ভিত্তি করে শিক্ষা সংক্রান্ত সবকিছু আবর্তিত হয়। শিক্ষক সর্বদা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করার মাধ্যমে সমকালীন মানের সমতুল্য হবেন, যাতে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে চলমান বিশ্বকোষ বলে মান্য করে এবং ভালোবাসা ও সর্বোপরি বিশ্বস্ততার প্রতিভূ বলে মনে করে। শিক্ষককে সেই পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে, যাতে তিনি একেবারে শেষতম প্রযুক্তির কথা পড়ুয়াদের জানাতে পারেন এবং তা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারও করতে পারেন, যাতে প্রযুক্তি ও শিক্ষক দ্বারা প্রদেয় শিক্ষা ভারতের স্বাভাবিক শিক্ষাপদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে। জ্ঞান ও আলোকের দিকে যাত্রা অন্তহীন। এই ধরনের যাত্রা মানবপ্রগতির নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে, যেখানে নীচতা, বিশৃঙ্খলা, ঈর্ষা, ঘৃণা ও শত্রুতার কোনো স্থান নেই। এই জ্ঞানালোক মানুষকে সম্পূর্ণ করে, করে মহাত্মা ও পৃথিবীর সম্পদ। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ প্রকৃত অর্থে এই ধরনের শিক্ষার ভিত্তিভূমি।

প্রকৃত শিক্ষা মানবচরিত্রকে মহিমা দান করে এবং একজন মানব বা মানবীর আত্মসম্মানকে দৃঢ় করে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি শিক্ষকের সহায়তায় প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করার পর সেই শিক্ষাকে কর্মক্ষেত্রে বিকশিত করে, তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবী আরও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।' শিক্ষা নিয়ে দিনরাত চর্চা, তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাপদ্ধতির শেষতম খোঁজখবর না রাখলে মাটি-সম্পৃক্ত উচ্চস্তরীয় শিক্ষা স্বরূপের এমন বর্ণনা সম্ভব হত না। দেশের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করেও তিনি মুহূর্তের জন্যও বাবা-মা ও তাঁর শিক্ষকদের বিস্মৃত হননি। ফলে গুরুজনদের প্রতি তাঁর ছিল সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাবোধ। চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রতি এক ভাষণে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'আপনাদের পেশা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি বিশ্বাস করি, সমাজে আপনাদের দানের চেয়ে অন্য কোনো দান বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষালয়, শিক্ষানীতি, শিক্ষাদর্শ, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি নিয়ে বহুবিদ্যাজ্ঞ আবদুল কালামের নিজস্ব ভাবনাসমৃদ্ধ শিক্ষাচর্চার সঙ্গে এতক্ষণ পরিচিত হয়েছি আমরা। তাঁর জীবনাবসানের পর-পরই দেশের কয়েকটি রাজ্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু এ-তথ্যটি অনেকের অজানা যে, জীবিতকালেই রাষ্ট্র সংঘ ২০১০ সালের ১৫ অক্টোবর তাঁর ৭৯-তম জন্মজয়ন্তীকে বিশ্ব ছাত্র দিবস হিসেবে পালন করে। রাষ্ট্রপতি, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হয়েও যে-মনীষী শিক্ষকতাকে নিজের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেন, যিনি দেশের উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী পড়ুয়াদের পাশাপাশি দেশের একেবারে চরম অবহেলিত গ্রামের দলিত ও আদিবাসী শিশুদের হাতে ধরে ব্ল্যাকবোর্ডে অ, আ, ক, খ লিখতে শেখান এবং তাদের সঙ্গে একাসনে বসে মিড ডে মিলের খাবার খান, তিনিই তো চিরস্মরণীয় ছাত্রসখা দেশবন্ধু ও দেশের প্রকৃত জননায়ক। তাঁর প্রয়াণ দেশবাসীর জন্য, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের জন্য যে অপূরণীয় ক্ষতি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ও গুজরাতের কচ্ছ থেকে নাগাল্যান্ডের কোহিমার অসংখ্য শিক্ষার্থীর রাশি রাশি প্রশ্নের অনুপ্রেরণাদায়ী সদুত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে ই-মেল পড়তে কম্পিউটারের সামনে আবদুল কালাম আজ আর বসে নেই।

আমাদের দীর্ঘ সমীক্ষণের সমাপাতন রাষ্ট্রপতির প্রতি এক বাঙালি তরুণীর আপাত কঠিন একটি ঔৎসুক্য দিয়ে করতে আগ্রহী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কল্যাণী দাসের প্রশ্ন: 'যদি প্রত্যেকেই শিক্ষিত হয়ে যায়, তাহলে কারা তথাকথিত ঝাড়ুদার, ধোপা ও এইরকম ভৃত্যসম গার্হস্থ্য ও নীচ কাজগুলি করবে। আপনি কি মনে করেন, সকলের জন্য শিক্ষা আমাদের সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান ঘটাতে পারবে?' দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালামের সপ্রতিভ উত্তর: 'কোনো কাজই ভৃত্যসম গার্হস্থ্য ও নীচ নয়। শিক্ষা ওই একই কাজ সুলভে, দ্রুততর ও সর্বোত্তম উপায়ে করতে মানুষকে সক্ষম ও সমৃদ্ধ করবে।'

তথ্যপঞ্জি

১. A P J Abdul Kalam, 'Spirit of India', Rajpal & Sons, Delhi, 2013.
(প্রশ্নোত্তরগুলির বেশিরভাগই এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত। ভাবানুবাদ বর্তমান নিবন্ধকারের।)
২. সত্যম রায়চৌধুরি-সম্পাদিত, 'কালাম কথা', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬।
৩. এ পি জে আবদুল কালাম, সহযোগী লেখক: অরুণ তিওয়ারি, 'অগ্নিপক্ষ: আত্মজীবনী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৫।
৪. এ পি জে আবদুল কালাম, 'সন্ধিক্ষণ: প্রতিকূলতা জয়ের লক্ষ্যে যাত্রা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৪।
৫. A P J Abdul Kalam & Sivathanu Pillai, 'We Can Do It: Thoughts for Change', Shree Book Centre, Mumbai, 2014.
৬. A P J Abdul Kalam & V Ponraj, 'A Manifesto For Change', Harper Collins Publishers, Noida, 2014.
৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫।
৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'সবাই আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে শপথ নিন', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

*এফআরও (ফ্লোর রিঅ্যাকশন অর্থোসিস): এটি ঘরের মেঝে বা সমতল জায়গায় সক্রিয় হওয়ার এক কৃত্রিম যন্ত্র, যা পা-কে চলাফেরা করতে আপেক্ষিকভাবে সহায়তা করে বা আটকায়। এটিকে ক্যালিপার (caliper)-ও বলা হয়। একবার হায়দরাবাদ হাসপাতাল পরিদর্শনকালে আবদুল কালাম দেখতে পান, এক পোলিয়ো-আক্রান্ত বাচ্চা

প্রায় তিন কেজি ওজনের এফআরও পরে কষ্টেসৃষ্টে হাঁটছে। ওই হাসপাতাল (নিজাম ইনসটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স)-এর অস্থি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. বি এন প্রসাদ ড. কালামের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে হালকা এফআরও প্রস্তুতের অনুরোধ জানান। কালাম ও তাঁর সহযোগীরা অগ্নি মিসাইল তৈরিতে ব্যবহৃত তাপ থেকে রক্ষাকারী যৌগিক পদার্থ দিয়ে কিছু দিনের মধ্যে মাত্র তিনশো গ্রাম ওজনের এফআরও প্রস্তুত করে ডাক্তারদের হাতে তুলে দেন। ডাক্তারদের সহায়তায় সেটি বাচ্চাদের পরানো হলে, হালকা হওয়ায় তারা খুশিতে লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে এবং এ-দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবারই চোখ আনন্দাশ্রুপূর্ণ হয়। উল্লেখ্য, যেখানে প্রচলিত এফআরও-র মূল্য ছিল তিন থেকে চার হাজার টাকা, কালামদের দ্বারা প্রস্তুত যন্ত্রটির মূল্য মাত্র পাঁচশো টাকা। এই মেডিকেল কলেজেরই প্রখ্যাত কার্ডিয়োলজিস্ট ডা. বি সোমা রাজুর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিনি ১৯৯৮ সালে হৃদ্‌রোগীদের জন্য সস্তা মূল্যের স্টেন্ট (stent) তৈরি করেন। এই স্টেন্টটির নাম কালাম-রাজু স্টেন্ট। কালাম-রাজু স্টেন্টের মূল্য মাত্র দশ হাজার টাকা। কিন্তু বাজারে প্রচলিত স্টেন্টের মূল্য পঁচাত্তর হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকা। রসিকতা করে কালাম একবার বলেছিলেন, অনেকে আমাকে বলে মিসাইল কিন্তু মানুষকে হত্যা করে। স্টেন্ট উদ্ভাবনের পর আমি তাঁদের বলি, স্টেন্ট হৃদ্‌রোগীদের বাঁচাবে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যবহারের জন্য তাঁরা কালাম-রাজু ট্যাবলেট তৈরিও করেন।

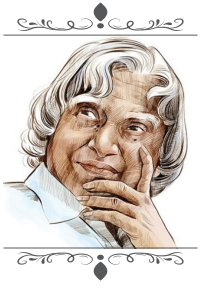

আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম

জীবনপঞ্জি

- সম্পূর্ণ নাম: আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম।
- সর্বজনপরিচিত নাম: এ পি জে আবদুল কালাম।
- প্রপিতামহ: আবুল।
- পিতামহ: পাকির।
- পিতা: জয়নুল আবেদিন।
- মাতা: আশিয়াম্মা।
- জন্মতারিখ: ১৫ অক্টোবর ১৯৩১।
- জন্মস্থান: ধনুষ্কোডি (রামেশ্বরম), তামিলনাড়ু।
- বিদ্যালয়: এলিমেন্টারি স্কুল, রামেশ্বরম। সোয়ার্জ হাই স্কুল, রামনাথপুরম।
- ১৯৫০: সেন্ট জোসেফ কলেজে বিএসসি কোর্সে ভর্তি। কলেজটি তিরুচিরাপল্লিতে অবস্থিত।
- ১৯৫৪—১৯৫৭: ম্যাড্রাস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক স্তরে পাঠ গ্রহণ।
- ১৯৫৮: ডিটিডিপি-তে এয়ারোনটিকস বিভাগে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ।
- ১৯৬২: নিরক্ষীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হিসেবে থুম্বা স্থানটি নির্বাচন। এবং থুম্বা ইকুয়েটোরিয়াল রকেট লঞ্চ স্টেশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

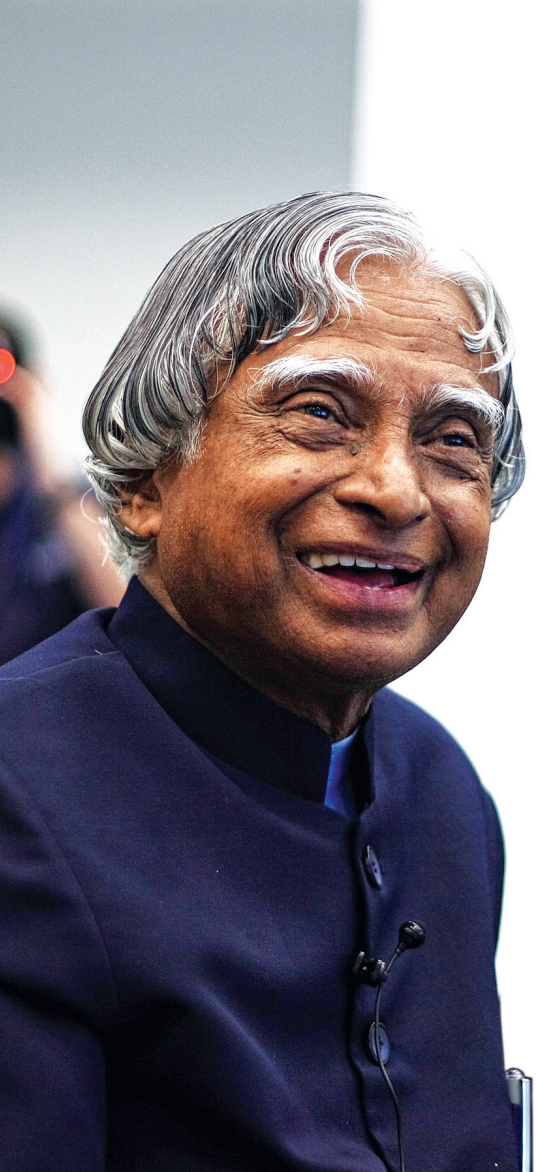

- ২১ নভেম্বর ১৯৬৩: থুম্বার নিরক্ষীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ভারতের প্রথম সাউন্ডিং রকেট নাইকে-অ্যাপাশের সফল উৎক্ষেপণ।
- ২০ নভেম্বর ১৯৬৭: থুম্বা নিরক্ষীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে রোহিণী রকেটের উৎক্ষেপণ।
- ১৯৬৮: ভারতীয় রকেট সংস্থার স্থাপনা। থুম্বা নিরক্ষীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি রাষ্ট্রপুঞ্জকে উৎসর্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- ৮ অক্টোবর ১৯৭২: র‍্যাটো সিস্টেমের সফল পরীক্ষণ। সুখোই-সিক্সটিন বিমানটির দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি র‍্যাটো দ্বারা সফল উড়ান।
- ১৯৭৬: বাবার মৃত্যু। মৃত্যুকালে বাবার বয়স ছিল একশো দু-বছর, বাবার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরে মায়ের মৃত্যু হয়।
- ১৮ জুলাই ১৯৮০: প্রথম উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হওয়ার পর এসএলভি-থ্রির দ্বিতীয় উৎক্ষেপণ। রোহিণী উপগ্রহের কক্ষপথে সার্থকভাবে স্থাপনা।
- ৩১ মে ১৯৮১: এসএলভি-থ্রির সফল উড়ান। আরএসডি-ওয়ান উপগ্রহটির কক্ষপথে স্থাপনা।
- ফেব্রুয়ারি ১৯৮২: ডিআরডিএল-এর ডিরেক্টর-পদে নিয়োগ।
- ২৭ জুলাই ১৯৮৩: ইনটিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের উদ্‌বোধন।
- সেপ্টেম্বর ১৯৮৬: পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্রের উড়াল পরীক্ষা।

- ২২ মে ১৯৮৯: অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্রের উড়াল পরীক্ষা।
- ১৯৯০: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি প্রদান।
- ১৯৯১: আইআইটি, মুম্বাই থেকে সাম্মানিক ডিএসসি উপাধি প্রদান।
- জুলাই ১৯৯২—ডিসেম্বর ১৯৯৯: প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা।
- ১৯৯৯—২০০১: ভারত সরকারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা।
- ১৮ জুলাই ২০০২: ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।
- ২৫ জুলাই ২০০২: ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথগ্রহণ।
- ২৫ জুলাই ২০০৭: রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ শেষ।
- ২৭ জুলাই ২০১৫: মৃত্যু। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর। শিলঙের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে বক্তৃতাদান-কালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং তার পরে মৃত্যু হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ সম্মান: ভারতরত্ন (১৯৯৭), পদ্মবিভূষণ (১৯৯০), পদ্মভূষণ (১৯৮১)।
- অন্যান্য পুরস্কার: ন্যাশনাল নেহরু পুরস্কার, আর্যভট্ট পুরস্কার, ড. বিরেন রায় স্পেস অ্যাওয়ার্ড, ওমপ্রকাশ ভাসিন পুরস্কার, বীর সাভারকার পুরস্কার, ইন্দিরা গান্ধী অ্যাওয়ার্ড ফর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন।

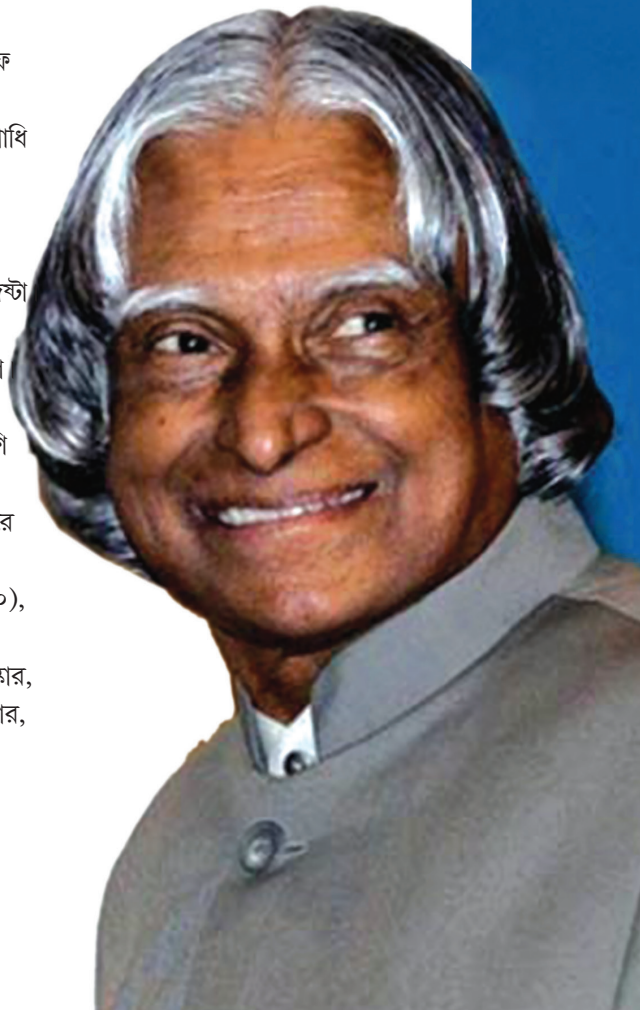

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

- ডেভেলপমেন্টস ইন ফ্লুইড মেকানিকস অ্যান্ড স্পেস টেকনোলজি, ১৯৮৮
- ইন্ডিয়া ২০২০: এ ভিশন ফর দ্য নিউ মিলেনিয়াম, ১৯৯৮
- উয়িংস অফ ফায়ার, ১৯৯৯
- ইগনাইটেড মাইন্ডস: আনলিশিং দ্য পাওয়ার উইদিন ইন্ডিয়া, ২০০২
- দ্য লুমিনাস স্পার্কস, ২০০৪
- মিশন ইন্ডিয়া, ২০০৫
- ইনস্পায়ারিং থটস, ২০০৭
- ইউ আর বর্ন টু ব্লসম: টেক মাই জার্নি বিয়ন্ড, ২০১১
- টার্গেট থ্রি বিলিয়ন, ২০১১
- টার্নিং পয়েন্টস: এ জার্নি থ্রু চ্যালেঞ্জেস, ২০১২
- মাই জার্নি: ট্রান্সফর্মিং ড্রিমস ইনটু অ্যাকশনস, ২০১৩
- ফোর্জ ইয়োর ফিউচার: ক্যানডিড, ফর্থরাইট, ইনস্পায়ারিং, ২০১৪
- রিইগনাইটেড: সায়েন্টিফিক পাথওয়েজ টু এ ব্রাইটার ফিউচার, ২০১৫
- ট্রান্সসেনডেন্স মাই স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্সেস উইথ প্রমুখ স্বামীজি, ২০১৫
- এনভিশনিং অ্যান এমপাউয়ার্ড নেশন
- এ ম্যানিফেস্টো ফর চেঞ্জ: এ সিকুয়েল টু ইন্ডিয়া ২০২০
- উই ক্যান ডু ইট: থটস ফর চেঞ্জ
- ইনডমিটেবল স্পিরিট
- স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া